পুনরাবৃত্তি

শ্রীমতী বাণী রায়

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় মুদ্রণ
শ্রাবণ, ১৩৬৩
আড়াই টাকা

লেখিকার অন্যান্য বই :

প্রেম
রঞ্জনরশ্মি
শ্রীলতা ও শম্পা
শূন্যের অঙ্ক
জুপিটার
সপ্তসাগর

মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ সরস্বতী প্রেস ১৭, ভীম ঘোষ লেন হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়
করকমলেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

এই গল্প সংগ্রহের লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায় আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদা। কবিতা বা গল্প লেখায় যে তাঁহার হাত আছে অতি-পরিচয়ের ফলে তাহা আমার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। আমি জানিতাম তিনি সস্তা সাপ্তাহিকের তথাকথিত মহিলা-বিভাগে রন্ধন-প্রসাধন বিষয়ক উপদেশাত্মক লেখা লিখিয়া থাকেন। আমার এই অজ্ঞান-প্রসূত অবহেলায় তাঁহার অভিমান-বোধ স্বাভাবিক। তিনি কোনদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। একদিন হঠাৎ তাঁহার একটি রচনার খাতা আমার হাতে পড়ে। অলস ঔদাস্যভরে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে "লুক্রেশিয়া" গল্পটি দেখিতে পাই। কয়েক পংক্তি পড়িয়াই বিস্ময় বোধ করি এবং আগ্রহের সহিত শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া লেখিকার শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই। বাঙালী মেয়ের পক্ষে এমন দুঃসাহস সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। লেখার বাঁধুনি এবং ধরনও সম্পূর্ণ নূতন। পুরাতনের পটভূমিকায় নূতনকে স্থাপন ও প্রকাশ করা, সচরাচর যে সব কথা বলা চলে না, প্রাচীন গ্রীক রোমীয় পুরাণের সহায়তায় তাহা বলা—ওই একটি গল্পের মধ্যেই শ্রীমতী বাণীর আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত মন ও তাঁহার শিল্পাদর্শের আভাস পাইলাম। আমি সম্পাদক, নূতন একজন শক্তিশালী লেখককে অত্যন্ত পরিচিতজনের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়া স্বতঃই আনন্দ হইল। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের জন্য "লুক্রেশিয়া" গল্পটি তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম।

যেমন ভাবিয়াছিলাম, গল্পটি প্রকাশিত হইবা মাত্র সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অনেকে গল্পের বিষয়বস্তুর জন্য লেখিকার নারীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। মোটের উপর সকলেই স্বীকার করিলেন যে বাংলা কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে একজন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

তাহার পর নানা প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে শ্রীমতী বাণীর গল্প-কবিতা-নাটকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি রসিক সমাজে এবং সাধারণ্যে

পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে কাহারও সংশয় নাই। তাঁহার যথাযোগ্য স্থান তিনি করিয়া লইয়াছেন। আজ তাঁহার সুবিখ্যাত গল্পগুলির ভূমিকায় কাহারও পরিচয়-পত্র সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে হইতেছে। শুধু লেখিকা শ্রদ্ধাবশত আমাকে সেই অনাবশ্যক অধিকার দিয়াছেন বলিয়া আমাকে কিছু বলিতে হইতেছে।

এই সংগ্রহে শ্রীমতী বাণীর সাতটি গল্প স্থান পাইয়াছে, পাঁচটি পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক পরিবেশে, দুইটি 'মহাশ্বেতা' 'ক্যামেলিয়া' দেশীয় কাব্যকাহিনীকে আশ্রয় করিয়া রচিত। সাতটি গল্পেই একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক অবলম্বিত হইয়াছে সুতরাং এগুলির একত্র সমাবেশ রসের দিক দিয়া সার্থক। 'পুনরাবৃত্তি' নামটিরও সার্থকতা এই যে একদিন সুদূর অতীতে কাব্যিক বা পৌরাণিক পরিমণ্ডলে যাহা ঘটিয়াছিল বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষিত নারীসমাজে অনুরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের পুনরাবৃত্তি লেখিকা দেখিয়াছেন। গল্পগুলি বিশেষ করিয়া বিদগ্ধ সমাজের জন্য লিখিত কারণ পুরাতনের সহিত নূতনের যোগসূত্র এত সূক্ষ্ম ও কেতাবী যে সাধারণ পাঠকের কাছে তাহার সম্পূর্ণ আবেদন সম্ভব নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আসল আখ্যানবস্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এমন গভীর, ট্রাজিক এবং মর্ম্মস্পর্শী যে সকলের মনেই রেখাপাত করিবে। ঘটনা সমাবেশও বাংলাসাহিত্যে নূতন এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুঃসাহসিক। কোনও পুরুষ লেখকের পক্ষে বাঙালী সমাজে এই ধরনের সিচুয়েশন-সৃষ্টি সম্ভব ছিল না, মেয়েরাও স্বাভাবিক ব্রীড়াবশত এগুলি এতকাল এড়াইয়া আসিয়াছেন। শ্রীমতী বাণীও অনেক দুঃসাহস সত্ত্বেও যে রহস্যের যবনিকা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই তাহার প্রমাণ তিনি কাব্য পুরাণের (প্রায়শই বৈদেশিক) ইঙ্গিতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন, মন্দিরার দুঃখ বুঝাইবার জন্য স্যাফোর অবতারণা না করিয়া তিনি পারেন নাই। রাডক্লিফ হলের 'নির্জনতার কূপ'কেও স্মরণ করিতে হইয়াছে, প্রতিভাশালিনী লেখিকা ললিতা দত্তকেও বাণভট্টের প্রতিভার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে।

এই পদ্ধতি শিল্পকে মোটেই ক্ষুণ্ণ করে নাই, বরঞ্চ সার্থক করিয়াছে,

সাহিত্যে ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা বড় সহজ নয় অবশ্য ইঙ্গিত সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক। শ্রীমতী বাণী রায় যে সকল ইঙ্গিতের আশ্রয় লইয়াছেন শিক্ষিত সমাজে সেগুলি সুবিদিত। তাঁহার 'জুপিটার' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সত্যই বলিয়াছেন, "বিদেশী গন্ধ অবশ্য আছে, কিন্তু বিজাতীয় নয়। শিক্ষিত বাঙালীর মন একে সহজেই স্বীকার করে নিয়ে একটু নূতন আস্বাদের আনন্দ পায়।...প্রকৃত কথা এই বিদেশী পুরাণ ইতিহাস সাহিত্যের কতক অংশ আমাদের মনে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশেছে। বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক।"

'পুনরাবৃত্তি'র গল্পগুলির ক্ষেত্রে এই জবাবদিহির প্রয়োজন ছিল না, কারণ এগুলি দেশী ও বিদেশী পুরাতন পরিবেশকে অতিক্রম করিয়াও স্বপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে এগুলি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত গভীর গহন রহস্যের সন্ধান বহন করিয়া আনিয়াছে। এগুলির স্রষ্টা নিজের জোরেই আপনার নির্দ্দিষ্ট আসন দখল করিবেন। আমি তাঁহাকে সস্নেহ অভিবাদন জানাইতেছি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

লুক্রেশিয়া

"গতকল্য রাত্রে গড়িয়াহাট রোডে একটি খানার পার্শ্বে একটি সুন্দর সুবেশ যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রহারজনিত ক্ষতের চিহ্ন ছিল। যুবকটিকে অবিলম্বে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।"

* * *

"গড়িয়াহাট রোডে যে যুবকটিকে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রবীর গুহ বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত গুহ গতকল্য অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে তিনি গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার পকেটের টাকা, ঘড়ি ও হাতের হীরার আংটি প্রভৃতি কিছুই অপহৃত হয় নাই। সম্ভবত আততায়ীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রহারে অচৈতন্য করিয়াছিল, কিন্তু কোন ভয় পাইয়া তাহারা তাঁহার টাকাকড়ি প্রভৃতি অপহরণ না করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার সি. আই. ডি. পুলিস এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।"

সংবাদপত্রে এই সংবাদটিতে কলিকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কর্নেল প্রশান্ত গুহর একমাত্র পুত্র প্রবীর গুহকে কে না চেনে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত লেখক,

জনপ্রিয়, কমনীয়মূর্তি প্রবীর গুহ কলিকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত, মনস্বী ছাত্র প্রবীর গুহের এই আকস্মিক বিপদে ছাত্রছাত্রী-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল।

পুলিস বহুদিন অপরাধীর অন্বেষণ করিল। প্রবীর গুহ আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটি চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া গেল। তাহার ছাত্রজীবন শেষ হইল নিরাশার অন্ধকারে। তাহার উদ্ধত লেখনী মূক হইল কলম ধরিবার অসামর্থ্যে। শোকাচ্ছন্ন মাতাপিতার সহিত সে কার্সিয়াঙে ভগ্ন-স্বাস্থ্য ফিরাইতে গেল। প্রায় এক বৎসর যাবৎ সে সেইখানেই আছে।

পুলিসের নিকট জবানবন্দীতে প্রবীর গুহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সে গড়িয়াহাট রোড দিয়া একাকী ফিরিতেছিল। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের মধ্যে একজন মুখোশপরা লোক সহসা তাহাকে আক্রমণ করে। তাহার পর আর তাহার কিছুই মনে নাই। আততায়ীর চেহারা সম্বন্ধে প্রবীর গুহ কিছুই বলিতে পারে নাই।

এই আক্রমণের প্রকৃত ঘটনা এবং আক্রমণকারীর প্রকৃত পরিচয় জগতে তিনটি ব্যক্তি মাত্র জানে—প্রবীর গুহ নিজে, মালিনী সেন এবং আমি।

জানি, এখনও প্রবীর গুহর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়, তাহার প্রতিভার অপমৃত্যুর জন্য অজানা সেই দুর্বৃত্তকে অভিশাপ দেওয়া হয়, ইংরাজ শাসনের নিন্দা করা হয়—পথচারী ব্যক্তির জীবন এখনও নিরাপদ নয় বলিয়া।

আমি জানি, প্রবীরকে নিষ্ঠুরভাবে কে প্রহার করিয়াছিল এবং কেন। আমি জানি, কেন প্রবীর গুহ লক্ষপতি পিতার পুত্র হইয়াও পুলিসের নিকট প্রকৃত ঘটনা বলে নাই। আমি জানি, কেন মালিনী সেনের গর্বিত মস্তক আজ অবনত, কেন প্রবীর গুহের নামে তাহার নয়নে বহ্নি জ্বলিয়া উঠে।

আমি অমর সোম—বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পঞ্চ-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, মালিনী আমার সহপাঠিনী এবং প্রতি-বেশিনী।

মালিনীর পিতা পাটনায় জজিয়তি হইতে বিদায় লইয়া, হিন্দু-স্থান পার্কে আমাদের পাশের বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। মালিনীর এক ভ্রাতা অধ্যাপক, অন্য ভ্রাতা ব্যারিষ্টার। বাহির হইতে আই. এ. পাশ করিয়া আসিয়া, মালিনী আশুতোষ কলেজ হইতে বি. এ. পাস করে।

আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়ি। আমার ইংরাজীতে অনার্স ছিল, মালিনীরও তাই। পাশাপাশি বাড়ি, উভয় পরিবারে সৌহার্দ। মালিনীর সহিত আমার সখ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

আজ মালিনী আমার কে জিজ্ঞাসা করিলে আমার উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু মালিনী আমার কে নয় তাহার উত্তরও আমার জানা নাই।

মালিনী বাংলার বাহিরে মানুষ। সমস্ত প্রকৃতিতে তাই তাহার একটা উন্মত্ত বন্যতা। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে অতিমুক্ত লতাটির মত। বাঙালিনীর ভীরু নম্রতা তাহার মধ্যে নাই, আছে অগ্নি, আছে দীপ্তি। তাহার ক্ষীণ শ্যাম দেহে, আকর্ণ-

বিশ্রান্ত কিন্তু অনতিপ্রশস্ত নয়নে, বক্র রক্ত-অধরে আছে অনল—যাহা পুরুষ চিত্তকে দগ্ধ করে, জ্বালা দেয়।

মালিনী কবিচিত্ত। তাহাদের বাগানে বসিয়া কতদিন তাহাকে দেশী বিদেশী কাব্য পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমাকে সে চিরদিন সঙ্গদান করিয়াছে, কিন্তু আমার নীরব প্রেম সে গ্রহণ করে নাই। বর্ষণমত্ত সন্ধ্যায় তাহার অবাধ্য অলক উড়িয়া আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, রৌদ্রপ্রসন্ন দিনে সে আরামভ্রমণে আমাকে সঙ্গী করিয়াছে, আকুল নিশীথে আমার সুরে সুর মিশাইয়া সে গান গাহিয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসায় তিলেকের জন্য সে ধরা দেয় নাই! তাহার অনল অন্য শিখাকে খুঁজিয়া মরিত, আমি তাহাকে কেবল শীতল জলই যোগাইয়াছি।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মালিনী আমাদের বাড়ি আসিল, তাহার চঞ্চল চরণছন্দে গৃহ মুখর হইয়া উঠিল।

"কি, একা একা ব'সে কবিতার বই পড়ছ? বাবাঃ, শেলীর কবিতা এখনও পড় তুমি! আমার ও ন্যাকামির ছড়া ভাল লাগে না। খালি ঘান-ঘ্যানানি! কিন্তু ক্রন্দনের সুরে মালিনী আবৃত্তি করিল—

"Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud
I fall upon the thorns of life—I bleed.

খিলখিল করিয়া হাসিয়া মালিনী আমার পাশে কাউচে লুটাইয়া পড়িল।

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। মালিনী আমার হাত হইতে বই কাড়িয়া লইল।

"চল, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যাক। অনার্সে তুমি আমি কেউই তেমন ভাল করি নি। এবারে গোড়া থেকেই [illegible] পড়ব—তুমি হবে ফার্স্ট, আর আমি সেকেণ্ড [illegible], তুমি সেকেণ্ড?—" মালিনী আমার চুলের উপর হাত রাখিল।

তাহার স্পর্শের উন্মাদ আকর্ষণ প্রাণপণে সংবরণ করিতে করিতে আমি উত্তর দিলাম, "তুমি ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড।"

এই গেল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশের ইতিহাস।

মাসখানেক পর। বিকাল চারিটায় মালিনী এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একত্রে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, মালিনীর ব্যারিস্টার দাদার গাড়িতে আমরা ফিরিতেছিলাম, পথে কোর্ট হইতে তাহার দাদাকে তুলিয়া লইতে হইবে।

সেনেট হলের পাশ দিয়া আসিতে হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়া আকুল স্বরে মালিনী বলিয়া উঠিল, "অমর, ও কে?"

চাহিয়া দেখি, গাড়ির চলার পথ করিতে লোহার গেটে একটি হস্ত স্থাপন করিয়া প্রবীর গুহ দাঁড়াইয়া। শিশুর মত স্ফুরিত ও সুগঠিত তাহার অধরোষ্ঠে জলন্ত সিগারেট। প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার জ্যোতি, দীর্ঘ সারসগ্রীবা একটু পশ্চাতে হেলানো। নারীসুলভ কমনীয় মুখে ঈষৎ বিরক্তি ও অপার আত্মমর্য্যাদার ছাপ। সাধারণের সহিত তাহার কোন সংযোগ নাই, যেন থাকিতেও পারে না।

মালিনীর উত্তেজিত, মুগ্ধ মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "ওর কথাই তো তোমাকে বলছিলাম সেদিন। ওই হচ্ছে প্রবীর গুহ—গতবারের ইংরেজী অনার্সে ফার্স্ট হয়েছে। আমাদের ইংরেজী কাগজটার সম্পাদক আর সেমিনারের সেক্রেটারী।"

"ওই প্রবীর গুহ! ভারী সুন্দর লেখে কিন্তু, অমন জোরালো লেখা কমই পড়েছি। আর লেখার সঙ্গে চেহারারও মিল আছে, তাই না?"

প্রবীর গুহ তাকাইল না, সোজাসুজি কোন নারীর দিকে সরল দৃষ্টিতে দেখা তাহার জন্মগত অনভ্যাস। তবে মালিনীকে সে পূর্বেই দেখিয়াছিল জানি। দেখিবার বস্তু কোন কিছুতে, বিশেষত স্ত্রীজাতিতে থাকিলে, তাহা তাহার বুদ্ধিপ্রখর দৃষ্টি এড়ায় না।

গাড়ি জনযানবহুল পথে আসিল। প্রবীরের উন্নত, কমমূর্তির দিকে চাহিয়া আধস্বরে, কপোত-গুঞ্জনের মত মালিনী আবৃত্তি করিল—

"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।"

আত্মবিস্মৃত হাসি তাহার মুখে, নয়নে স্বপ্নের ছায়া।

মালিনীর স্বপ্নালস হাসি আমার চিত্তে দহন আনিল। তাহাকে পরিহাস করিয়া সতর্ক করিলাম!

"চেহারাটা বাঁকা তলোয়ারের মতই, কিন্তু চরিত্র? সাবধান মালিনী, প্রবীর গুহের নৈতিক চরিত্রে শিথিলতা আছে। কোন মেয়েই ওর হাত এড়ায় না।"

মালিনীর বক্র অধরে শাণিত হাসি ঝলকিয়া উঠিল। প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের যোগ থাকে না, অমর। চাঁদ কলঙ্কি ব'লেই সুন্দর। আর—লোকে ত অনেকই বলে! এদেশে তিলকে তাল ক'রে তোলার প্রথা আছে, আমি জানি।"

"এত সুন্দর কি দেখলে তুমি মালিনী? তুমি তো কোন পুরুষকে সুন্দর দেখ না? অজ্ঞাতে হয়তো একটা নিশ্বাস পড়িল!

"তোমার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়তো প্রবীর গুহকে কেউ বলবে না। কিন্তু আমি দেখছি ওর ব্যক্তিত্বকে, ওর প্রতিভাকে ; চেহারা তার আধার মাত্র। কি আশ্চর্য !"

তাহার দিন দুই পরে বিতর্ক-সভায় প্রবীর গুহ নোয়েল কাওয়ার্ড সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিল। কুশাগ্র-বুদ্ধি তাহার, তীক্ষ্ণ বচন-বিন্যাস। প্রতিপক্ষের কলরব ভেদ করিয়া তাহার উদাত্ত কণ্ঠ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া ফেরে ; তাহার যুক্তি অসীম জ্ঞানের পরিচয় দেয়। সমুখের আসনেই মালিনী, রক্তপদ্মবর্ণের শাড়ী তাহার রূপকে মুখরতর করিয়া তুলিয়াছে। চঞ্চল দৃষ্টি তাহার বারংবার প্রবীরের স্থির প্রদীপ্ত দৃষ্টির সহিত মিলিত হইতেছিল।

তাহার পরের দিনই মেয়েদের বসিবার ঘরের সামনে দেখিলাম, প্রবীর ও মালিনী অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করিতেছে। প্রবীরের পদ্মপলাশ নেত্রে ব্যাধের কটাক্ষ, মালিনীর নয়নে আত্মসমর্পণের অসহায়তা।

সহসা মনে হইল, বিশ্ববিদ্যালয় যেন তিমিরগুণ্ঠনে ঢাকিয়া গেল, যেন আমার চারিপাশে শত শত অলিন্দ স্থপতিশিল্পের নিদর্শনরূপে আমাকে বেড়িয়া ধরিল। সম্মুখে খরস্রোতা টাইবার, তাহার তীরে উচ্চ গিরিশ্রেণীর উপরে আভাস-স্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিল রোম নগরী। কত যুগান্তের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া আমার জন্মান্তরের প্রিয়া যেন অশান্ত ক্রন্দনে আমাকে ডাকিতেছে। 'লুক্রেশিয়া !' ডাকিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আমি—আমি তো 'কোলাটিনাস' নহি, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অমর সোম। আমার নির্যাতিতা, 'লুক্রেশিয়া' তাহার বিষাদম্লান দৃষ্টি, অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি লইয়া ক্ষণতরে দেখা দিয়া সরিয়া গিয়াছে। আমার

সহপাঠিনী মালিনী শুধু ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রবীর গুহর সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। আমার রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে। কুয়াসাস্তিমিত অতীতের পটে টাইবারের স্রোত ঝিলিক দিয়া আবার বিস্মৃতির তমিস্রায় অন্তর্হিত হইল। আমি তো কোলাটিনাস নহি, তবে কিসের প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ? আমার হস্ত কেন আপনি মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, সমগ্র শরীর আহত ব্যাঘ্রের মত কাহার উপর সরোষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়?

মনে মনে হাসিলাম। রাত্রিজাগরণ ও কাব্যচর্চার মাত্রা কমাইতে হইবে। মালিনীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম; প্রবীর গুহ তখন চলিয়া গিয়াছে।

"কি কথা হচ্ছিল তোমাদের? বেশ তো আলাপ হয়ে গেছে দেখছি।" প্রশ্ন করিলাম।

মালিনী উত্তর দিল, "একটা চ্যারিটি পার্ফর্ম্যান্স হবে, তাই গান দিতে বলছিলেন।"

কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। প্রবীর গুহের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আভাসে জানি নারীদেহের প্রতি তাহার দুর্বার লোভ। কুমারীর কোমল অধর তাহার লেখনীকে প্রেরণা যোগায়; পবিত্রতার নীতিশাস্ত্রে তাহার আস্থা নাই। সে প্রতারক নহে, কিন্তু সে শিকারী। সে তাহার লক্ষ্যকে জানাইয়া দেয় যে শরসন্ধান চলিতেছে। হৃদয়হীন সে নহে, অতি-আধুনিক-মাত্র।

ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে আমার মুখ হইতে বাহির হইল—

"If Collatine, thine honour lay in me,
From me by strong assault it is bereft."

"কি বলছ অমর ?"—মালিনী জিজ্ঞাসা করিল।

"বলছি—।" আবার অজ্ঞানের মত শুনিলাম আমিই বলিতেছি—

"Yet die I will not till my Collatine
Have heard the cause of my untimely death;
That he may vow, in that sad hour of mine
Revenge on him that made me stop my breath."

"কোথা থেকে বলছ অমর ? কোলাটাইন নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।—" মালিনীর চক্ষুতে নিবিড়তা নামিয়া আসিল। সুদূর আকাশে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে নামটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল।

লঘুকণ্ঠে বলিলাম, "শেক্সপীয়ারের লুক্রেশিয়ার আক্ষেপ বলছি, বুঝলে ? যখন প্রবীর গুহর সঙ্গে কথা বলছিলে, কেন জানি না, কেবলই তোমাকে লুক্রেশিয়া ব'লে ভুল করছিলাম। স্বামী কোলাটিনাস বাইরে। নির্জন ঘরে লুক্রেশিয়াকে সেক্সটাস আক্রমণ করেছে তার সর্বনাশের জন্যে। কোলাটিনাস অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছিল।"

মালিনী হাসিয়া উঠিল। পাথরের মালা যেন মেঝেতে ছিঁড়িয়া পড়িল, এমন রাগিণীময় তার হাস্য। একটি কৃশকায় ছাত্র চলিতে চলিতে ফিরিয়া চাহিল। একজন ছাত্রী বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

"অদ্ভুত কল্পনা তোমার! আমি রোমান সুন্দরীই বটে! আচ্ছা, প্রবীরকে কি মনে হ'ল ?"

"সেক্সটাস।"

তীব্র দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা হানিয়া চাপা গলায় মালিনী বলিল, "ছিঃ!"

ছয় মাস পরে।

মালিনীর গৃহে সান্ধ্যভোজন। উপলক্ষ কিছু নহে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

প্রবীর বসিয়া ছিল বাঁকানো শেটিতে অলস ভঙ্গিতে। হাতে তাহার ধূমায়মান সিগারেট। সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া উজ্জ্বল হীরক-অঙ্গুরীকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিম অধরোষ্ঠে ইস্পাতের মত ধারালো কৌতুকের হাস্য। চোখে নরম, প্রেমজড়িত আদরের দৃষ্টি। সকলের সম্মুখে যাহা মুখে আসে না, তাহা যেন দৃষ্টির সহিত সে মালিনীকে নিবেদন করিতেছিল। প্রতিটি কটাক্ষ যেন তাহার এক একটি চুম্বন।

মালিনী আমার পাশে বড় সোফায় বসিয়া ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছিল। আজও সে পরিয়াছে রক্ত-গোলাপ রঙের রেশমী শাড়ি। কালো চুলে জড়ানো তাহার গোলাপের মালা; হাতে লাল গালার জরি-জড়ানো চুড়ি, কানে গলায় লাল প্রবালের গহনা। এ যেন জ্বলন্ত বহ্নি-শিখা, উদগ্রকামনায় জ্বলিতেছে কাহাকেও আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত।

আর ওই যে স্তিমিত-গৌর তরুণ পুরুষ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অর্দ্ধশয়ান, যাহার প্রশান্ত ললাটে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হইতেছে, অলস তন্দ্রার ছায়া রমণী-সুলভ আঁখিপল্লবে বাসা বাঁধিয়াছে, যাহার সবল দীর্ঘ তনু প্রেম ও কামনায় প্রোজ্জ্বল—সেও এই একই অগ্নি। আগ্নেয়গিরির ভস্ম-আবরণে সে প্রসুপ্ত। তাহাকে চেনা যায় না; অথচ তাহারই অগ্নি উদ্গীরণে একদিন ধ্বংস আসে—কত পম্পিয়াই তাহার লাভাস্রোতে ভাসিয়া যায়। একই বহ্নি উভয়কে আকর্ষণ করিতেছে প্রবল বেগে, শুধু তাহার রূপ

বিচ্ছিন্ন। সর্বনাশা এই মোহ, কে কাহাকে গ্রাস করিতে পারিবে ঠিক নাই।

আমার অবশ দেহে মালিনীর রক্ত-অঞ্চল বহুবার লাগিতেছে। তাহার চপল বাহু কতবার আমাকে ছুঁইয়া গেল। কতবার আমার কাঁধে সে করাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া আমার চোখের উপর নত হইয়া হাসিল। কি অন্ধ আকর্ষণ তাহার দিকে আমাকে অহরহ টানে! প্রতিটি রক্তকণিকা তাহাকে খুঁজিয়া ব্যর্থ প্রতীক্ষায় মন্থর হইয়া যায়। পুরুষের বুভুক্ষু যৌবন নিয়ত তাহাকে প্রার্থনা করে। মনে হয়, কত দিন হইতে চিনি তাহাকে। কত নীল সমুদ্রের পাশে পাশে তাহার আঁখি আমাকে সঙ্কেতে ডাকিয়াছে। কত দুর্বার রণক্ষেত্রে তাহার মুখের ছবি আমার শত্রু-রক্ত-স্নাত-হস্তে বল যোগাইয়াছে। আমি তাহাকে চিনি। জন্মজন্মান্তর হইতে তাহার সহিত আমার যোগাযোগ। কিন্তু এ জন্মে অমর সোম বৃথাই মালিনী সেনকে চাহিয়া মরে। মালিনী জনারণ্যে তাহার সে চেনা মুখখানি ভুলিয়া গিয়াছে।

"যাই বল মালিনী, ছেলেমেয়েতে বন্ধুত্ব আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে 'আহ্বানে' একটা কবিতা লিখেছিলাম আমি, বছর খানেক আগে। আর নিছক নিরামিষ বন্ধুত্বের প্রয়োজন কি? যদি মনে দোলা লাগে, লাগুক। কারও কোনও ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুখ পেলে কেন ছেড়ে দেব?"—হাতের সিগারেটের দিকে চাহিয়া প্রবীর চিন্তিতভাবে বলিল।

মালিনী হাসিল। মনে হইল সে যেন ধরিয়া লইয়াছে, প্রবীরের উচ্ছৃখল কথাবার্তার সহিত তাহার চরিত্রের কোন যোগ নাই। অধিকাংশ শিল্পীর মত প্রবীরও আত্মপ্রতারক। উন্নত মনা, সংযমী

প্রেমিক তাহার মধ্যে চির-জাগ্রত। মুখের কথায় প্রবীর অন্তরকে গোপন করিতেছে।

মনে হইল চীৎকার করিয়া বলি, মালিনী, মালিনী! এত তেজ, এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভুল ক'র না। প্রবীর গুহর খেলাই এই। সে যা মনে করে, হাসির ছলে অন্য পক্ষকে পূর্বেই তা জানিয়ে দেয়। অপরপক্ষ যদি সেটাকে পরিহাস বা মুখের কথা মাত্র মনে করে, তবে দোষ প্রবীরের নয়।

প্রবীর চুম্বনের ভঙ্গিতে অধর অগ্রসর করিয়া সিগারেট ধরিল। মৃদু টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল, "বিবাহের প্রয়োজন নেই, নিরামিষ বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন নেই। জগৎটা কেবল দেখে যাও। আনন্দ, আনন্দই সার। জীবন ক্ষণিকের। তাই বলি মালিনী, পুরুষের বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'র না। কারণ—

"Friendship's cool water
Any moment can change into wine."

মালিনীর দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলাম, বন্ধুত্বের শীতল পানীয় তাহার কাছে বহু পূর্বেই সুরায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

সকলকে বিদায় দিয়া মালিনী বাগানে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চৈত্রের রাত্রি, আকাশে ভরা জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না তাহার বক্র অধরে, তীক্ষ্ণ নয়নে, কালো চুলে।

"প্রবীরকে নিয়ে একটু বাড়িয়েছ মালিনী। এখনও সাবধান হও। প্রবীর ভাল ছেলে নয়।"

মালিনীর দীপ্ত সৌন্দর্য্য জ্বলিয়া উঠিল। "ভাল কি মন্দ, তা নিয়ে লোকের মাথা-ব্যথা কেন? ভাল ছেলে! ভাল ছেলে দেখে দেখে আমার অসহ্য হয়েছে। আমি শিশু নই অমর, মনে রেখো।"

মরিয়া হইয়া বলিতে লাগিলাম, "প্রবীরদের বাড়ি অত্যন্ত সেকেলে। আর, তুমি তো জান ও বিবাহে বিশ্বাস করে না। এখন তো দূরের কথা, কোন দিনই হয়তো বিয়ে করবে না। মালিনী, বিপদে পড়বে তুমিই, কারণ তুমি ওকে যতটা ভালবেসে ফেলেছ, ও তোমাকে তা বাসে নি।"

আহতা সর্পীর মত মালিনী দেহ কুঞ্চিত করিল, সুর্মালাঞ্ছিত ছুরির ফলকের মত সঙ্কীর্ণ তাহার চক্ষু সর্পীর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চোখে ঘৃণা ও দম্ভ।

"কি পাগলের মত বলছ অমর? বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না এখানে। প্রবীরকে আমি হয়তো ভালবেসেছি; না জেনে, অস্বীকার করব না। কিন্তু আমি জানি, আমার ভালবাসার ও যোগ্য। লোকে ওকে বোঝে না, ওর প্রতিভার মূল্য মিনমিনে বাংলা দেশ দিতে পারে না। তোমরা, তথাকথিত শুদ্ধ শান্ত ভাল ছেলেরা, ওর মুখের কথা, বাইরের ব্যবহার দেখে ভুল কর। বড় সুন্দর মন প্রবীরের। আমি ওকে ঠিক চিনেছি। সমস্ত সামাজিক বন্ধন, সংস্কারের ওপরে প্রবীর গুহ। অসাধারণ ওর ব্যক্তিত্ব।"

নদীর ধ্বংসমুখী তীরে দাঁড়াইয়া আছে আমার প্রিয়া। তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই আমার। অদৃশ্য বিপদ তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সরল শিশুর মত নিজের পবিত্র নির্ভরশীল মন দিয়া সে বিশ্বের বিচার করিতে চায়।

আবার তাহার দিকে চাহিলাম, বলিলাম, "তুমি প্রবীরকে বোঝনি মালিনী, যতই তোমার বুদ্ধি থাক বা দীপ্তি থাক। চিরকাল বাংলার বাইরে তুমি মানুষ, সরল খোলা জীবন তোমার, মানুষের জটিলতা-কুটিলতার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। মালিনী, তুমি

সৎ মেয়ে, অসৎ পুরুষের কামনা বোঝা তোমার সাধ্যের বাইরে। প্রতিভা আছে প্রবীরের, কিন্তু সে প্রেমিক নয়, কামুক।”

“অমর, অনেকক্ষণ তোমার ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা সহ্য করেছি, আর নয়। মনে রেখো প্রবীর আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই। আমার সঙ্গে প্রবীরেরও বন্ধুত্ব আছে তোমারও তাই। কিন্তু সে তো কখনও আমাকে উপদেশ দিতে আসে না?”—মালিনী সম্মুখের গাছ হইতে তুইটি ফুল ছিঁড়িয়া সরোষে কুটি কুটি করিয়া ছড়াইয়া ফেলিল।

যন্ত্রণায় আমার মুখ নীল হইয়া গেল। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো মালিনীর অর্ধচন্দ্র ললাটে নিজের ছায়া দেখিতেছিল। শিথিল তাহার কেশবন্ধন, আঁখিপটে বিপুল শ্রান্তি। বক্র রক্ত-অধরে তাহার চাঁদের আলো। আজ যেন সে অধর তত বক্র, তত উদ্ধত নয়। যেন অন্য অধর তাহাকে নিজের বলে নত করিয়াছে। তাহার অধরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতিকষ্টে আবার বলিলাম, “উপদেশ দিচ্ছি না মালিনী, বন্ধুত্বের দাবীতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তোমার ভাবালু কবি মন এ পৃথিবীতে চলে না। প্রবীর তোমার মত নয়। তুমি যা, বাইরে সে তারই ভাণ মাত্র। কিন্তু ও কি মালিনী, ও কি তোমার ঠোঁটে—প্রবীর কি? মালিনী, মালিনী উত্তর দাও।”

আহত পশুর মত বেদনায় আমার স্বর নির্জন রাত্রিতে বীভৎস শুনাইল।

গর্বিতা রাণীর ভঙ্গিতে মালিনী গ্রীবা বক্র করিল।—“হাঁ যা অনুমান করেছ সত্যি। প্রবীর আমাকে চুম্বন করেছে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো তাকে ভালবাসি।”

তাহার পর প্রায় পনরো দিন মালিনীর বাড়ি যাই নাই, কথাবার্তাও হয় নাই। ক্লাসে দেখি সম্রাজ্ঞীর মত মালিনী নির্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসে, কোন দিকে না চাহিয়া ক্লাসের শেষে চলিয়া যায়। আর মাঝে মাঝে দেখি, বিকালে তাহার গাড়িতে প্রবীর গুহকে।

সন্ধ্যার ছায়া টাইবারের তীরে তীরে নামিয়া আসিয়াছে। কুঞ্চিত কেশ মেষপালকেরা অঙ্কুশহস্তে দুগ্ধফেনের মত শুভ্র মেষকুলকে গৃহে লইয়া যাইতেছে। দূরে উচ্চ পর্বতবক্ষে মিনার গম্বুজ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। গোধূলির মুমূর্ষু আলো রোমকে স্বর্ণফলকে মুড়িয়া তুলিয়াছে। স্বপ্নকুহেলিমণ্ডিত প্রাসাদগৃহে সুপ্তা সুন্দরী। কতযুগের অন্ধকার বিস্মৃতি যেন দূরে সরিয়া গেল, মনের গহন অতল হইতে নিদ্রিত অনুভূতি আবার জাগিয়া উঠিল। আবার প্রতিশোধের অনল দেহে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। সেক্সটাসের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া লোলুপ অসি উদ্যত হইতে চায়।

নিরুদ্ধ কামনাভারে দেহ মূক। লুক্রেশিয়ার ঘুমন্ত অধরে সেক্সটাসের অধর। লুক্রেশিয়ার দেহবল্লীর উপরে সেক্সটাসের কঠিন দেহ নামিয়া আসিতেছে ধীরে—অতি ধীরে।

বদ্ধকণ্ঠে স্বর আসিল না, চমকিয়া জাগিয়া দেখিলাম শয্যা ঘর্মাক্ত। প্রবীর গুহ তাহার কাগজের জন্য একটি কবিতা চাহিয়াছে, তাহাই লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নের স্পর্শ তখনও যেন চোখে লাগিয়া আছে। তখনও যেন কানে লুক্রেশিয়ার আর্ত হাহাকার ভাসিয়া আসিতেছে। কত দূর শতাব্দীর পারে বসিয়া সে যেন আহ্বান করিতেছে। তাহার হৃদয়

মথিত করুণ রোদন আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আমায় ডাকিতেছে, কোলাটিনাস! কোলাটিনাস!

এ ডাক না শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার চিত্ততন্ত্রী এই এক সুরে বাঁধা যুগ যুগ হইতে। জানি, আমাকে যাইতে হইবে।

ক্ষিপ্রহস্তে বেশভূষা সারিয়া লইলাম। মালিনীর বাড়ি সন্ধ্যার পর পৌঁছিলাম। বাহিরের ঘরে মালিনীর অধ্যাপক দাদা ও ব্যারিস্টার দাদা উচ্চ স্বরে আলোচনায় রত। মালিনী মাতৃহীনা, তাহার বড় বউদিদি রাস্তার দিকের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাদর আহ্বান চিরদিনই মালিনীর বাড়িতে পাই। প্রশ্নের উত্তরে শুনিলাম, মালিনী কলেজ হইতে এখনও বাড়ি ফেরে নাই, সঙ্গে গাড়িতে আছে কেবল প্রবীর গুহ। অধ্যাপক বলিতেছেন, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমার। স্ত্রীশিক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারিতা!" ব্যারিস্টার আমার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, "এ তোমার বেশি বলা হচ্ছে দাদা। কলেজের বন্ধু, ভদ্রঘরের ছেলে। তার সঙ্গে বেড়াতে গেছে তাতে ক্ষতি কি? মেয়েদের কি এতই ঠুনকো মনে কর—এতই দুর্বল? আর মালিনী সে জাতের মেয়ে নয়। নিজের ভার সে নিজে নিতে জানে।"

আমার দিকে চাহিয়া অধ্যাপক চুপ করিলেন। হায়! তাঁহারা মনে করেন, মালিনীর বরমাল্য একদিন আমার কণ্ঠেই পৌঁছিবে।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। যে যাহার কাজে চলিয়া গেলেন, আমারই প্রতীক্ষা শুধু শেষ হইল না।

অবশেষে গভীর রাত্রে এক গাড়ি আসিয়া থামিল। দেখিলাম, এক ছায়ামূর্তি নামিয়া অসংলগ্ন দ্রুত পদে পিছনের দ্বার দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলাম, "মালিনী!"

সহসা তাহার ক্ষীণ দুই বাহু আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া মালিনী কাঁদিয়া উঠিল। দেবতার মন্দিরে পূজারীর মত সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় দুই হাতে আমি সেই চিরপ্রিয় মুখখানি তুলিয়া দেখিলাম।

চক্ষু তাহার আরক্ত, অধর বিশুষ্ক ও স্ফীত। করবীর বন্ধন অর্ধেক খুলিয়া চুল জটাতে পরিণত হইয়াছে। শাড়ীর স্থানে স্থানে কাদা, গায়ের জামা ছিন্ন, সমস্ত শরীর তাহার যেন কেহ শুষিয়া মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আমার নিকটে মালিনী কম্পিত ভগ্নস্বরে সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। সে ও প্রবীর বেড়াইতে গিয়াছিল লেকে, ফিরিবার পথে প্রবীর তাহাকে গড়িয়াহাটার নির্জনতম কোণে তাহাদের একটা বাগান-বাড়ি দেখাইতে লইয়া যায়। তাহার উদ্দেশ্য মালিনী বুঝে নাই, মালিনী তাহাকে বিশ্বাস করে। গাড়ি অনেক দূরে ছিল, বাগানবাড়ি নির্জন। বসিবার ঘরে প্রবীর তাহাকে লইয়া প্রেমাভিনয় আরম্ভ করে। মালিনী প্রথমে তাহাকে প্রশ্রয়ই দিয়াছিল, কিন্তু শেষে প্রবীরের কামনার মাত্রা দেখিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পলাইতে সমর্থ হয় নাই। কুমারী-জীবনের চরম অসম্মান তাহার হইয়া গিয়াছে।

সর্বশরীর মালিনীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, নিদারুণ শ্রান্তিতে আত্মগ্লানিতে সে অবসন্ন। শিশুর মত তাহাকে বক্ষে

তুলিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলাম, সস্নেহে শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। চক্ষের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, "ডাক্তার ডাকি?"

"না, অমর, না। আমার লজ্জার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ যেন জানে না। উঃ, লোক-জানাজানি হবে ব'লে কুকুরটাকে শিক্ষাও দিতে পারব না, এই আমার ক্ষোভ।"—নিরুপায় ক্রোধে মালিনী শুভ্র মুক্তাদন্ত দিয়া বিছানার চাদরখানা ছিন্ন করিতে লাগিল।

"লোক-জানাজানি হবে না, তাকে শিক্ষাও তুমি দিতে পারবে মালিনী। আমি এখনই যাচ্ছি। এখনও তো সে গড়িয়াহাটার বাগানবাড়িতে আছে বলছিলে না?"—অসহ হৃদয়াবেগ দমন করিয়া শান্তস্বরে বলিতে পারিলাম।

"তুমি যাবে? তুমি যাবে অমর?—উত্তেজনায় মালিনী শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, দুই হাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি যাও। আমি, আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি, সেই কষ্ট সেটাকে দিতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর অমর, এর শাস্তি তুমি দেবে তাকে? দয়া ক'রে ছেড়ে দেবে না। মাটিতে তার মাথা লুটিয়ে দিয়ে সেই মুখ তোমার জুতো দিয়ে থেঁতলে দিও। যে হাতে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিতে আমাকে ধরেছে, সেই হাত তার জন্মের মত ভেঙে দিও। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ভাল সে আমাকে বাসে নি। আজ স্পষ্টই বলে দিল।"

আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার শতাব্দীর বিস্মরণের পরপার হইতে সেই গীতি বাজিয়া উঠিল—

"Revenge on him, that made me stop my breath!"

দরজার বাহিরে আসিতেই কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আহ্বান আসিল দুর্বল ভগ্নস্বরে, "অমর!"

দেহ তখন আমার রোমান বীরের বীর্যে উদ্বেল, তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য হয় না। কিন্তু যে কণ্ঠের একটি মাত্র আহ্বান আমাকে মৃত্যুর তীর হইতেও ফিরাইতে পারে সেই কণ্ঠের আহ্বানে আবার ফিরিলাম।

বালিশে মুখ লুকাইয়া, অস্পষ্ট স্বরে মালিনী কহিল, "কিন্তু,—তাকে প্রাণে মেরো না, অমর।"

প্রবীর গুহের সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই রাত্রে গড়িয়াহাটার রাস্তায়। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম পথের পাশে।

প্রবীর আমাকে চিনিয়াছিল, কারণ আমি মুখে কোনও মুখোশ ধারণ করি নাই, এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্বে প্রস্তুত হইবার সময় দিয়া আক্রমণের কারণ খুলিয়া বলিয়াছিলাম। তাহার পরের ঘটনা সকলেই জানিয়াছে। প্রবীর শক্তিশালী, নিজেকে রক্ষার চেষ্টাও তাঁহার প্রশংসার যোগ্য! কিন্তু আমি, আমি তো তখন শুধু বিংশ শতাব্দীর অমর সোম ছিলাম না, আমি তখন কোলাটিনাস।

প্রবীর আমার নাম পুলিশের নিকট করে নাই, ইহাও তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয়।

মালিনী আজও বাঁচিয়া আছে—আমিও আছি। লুক্রেশিয়ার পরিণতি তাহার হয় নাই। কিন্তু সে আমার কাছে আজ মৃতা। সে অন্যোপভুক্তা বলিয়া আমি দূরে সরিয়া যাই নাই—অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কিন্তু আমার যাহা জানিবার, তার সেই চরম অবমাননার সময় তাহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি। তাহার যন্ত্রণা

আমি ভুলিতে পারিয়াছি, ভুলিতে পাই নাই কেবল তাহার মুখের একটি কথা—তাকে প্রাণে মেরো না অমর।

রোমের প্রাচীন গাথায় ও মহাকবি শেক্সপীয়ারের কাব্যে একটি ভুল ছিল, আমার জীবনে সংশোধন হইয়া গিয়াছে।

আমার লুক্রেশিয়া আজীবন সেক্সটাসে আসক্তা।

মীডিয়া

অন্ধকার বিস্মরণীর তীরে আজও মীডিয়ার অশান্ত আত্মা বর্তমানকে স্পর্শ করিতে চায়। নারী আজও প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে জানে। আজও সে প্রতিশোধ লইতে ভুলিয়া যায় নাই। সহস্র যুগের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া নিখিল নারীর মধ্যে মীডিয়া আজিও চিরজাগ্রত।

আমার মন একটি ঘোলা জলের হ্রদ। তরঙ্গ নাই, স্রোত নাই, জলশোভার একান্ত অভাব। বাহির হইতে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ হইলে একবার মাত্র আন্দোলিত হইয়া ওঠে। আবার সে নিস্তরঙ্গ, নির্বিকার। কিন্তু আজকাল আমিও স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি। আমি স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে, যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী নিমন্ত্রণ বাটিতে এক বিবাহিতা রমণীর মুখে নাইট্রিক অ্যাসিড্ নিক্ষেপ করে।

আমিও স্বপ্ন দেখি। কত স্বপ্ন! দূরে, বহুদূরে তমিস্রার পটভূমিতে গ্রীক বীর জেসন্—পঞ্চাশক্ষেপনীতে নৌকা দ্রুত চলিয়াছে। কোথায় কলকিস্, কোথায় সুবর্ণময় মেষরোম। দারুময়ী আথীনা পথ নির্দেশ করিতেছেন। সন্ধান পাইলে রাজ্যহারা রাজপুত্র রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।

পঞ্চাশক্ষেপনীতে নৌকা চলিয়াছে—বন্য পার্বত্যভূমি তীর রচনা করিয়া দূরের ইঙ্গিত পাঠাইতেছে। হারকিউলিসের হাস্যধ্বনিতে সমুদ্র তরঙ্গ প্রকম্পিত। পার্শ্বে সমাসীন যুগল অশ্বিনীকুমার—'ক্যাষ্টর' ও 'পোলাক্স্'।

তরণী চলিয়াছে—দূরে, বহুদূরে যেখানে মীডিয়ার তরুণ আঁখি-

পল্লবে প্রেমের স্বপ্ন। আরো দূরে উত্থানের শ্যামশোভাকে প্রদীপ্ত করিয়া জ্বলিতেছে সেই পুরাণ-কথিত সুবর্ণময় মেষরোম। নীচে তাহার রক্ষী চিরবিনিদ্র ড্রাগন্‌। যাদুকরী তাহাকে নিদ্রাগত করিল। সুবর্ণময় মেষরোম ঈটিসের রাজ্য হইতে অপহৃত হইল। অপহরণকারী জেসনের সহিত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সভ্য গ্রীসে চলিয়া গেল—ঈটিসের কন্যা মীডিয়া। হায় প্রেমের সম্মোহন শক্তি!

পট পরিবর্ত্তিত হয়। আবার স্বপ্ন দেখি। কোথায় কুয়াশাচ্ছন্ন ছায়াভূমিতে বিচরণ করিতেছে মীডিয়া। সে শুভ্র মরালগ্রীবা ফিরাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আর তাহার সে অশ্রুতে জেসনের রাজ্যসম্পদ ধীরে ধীরে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। অগ্নিময় পরিচ্ছদ জেসনের নবপরিণীতাকে দগ্ধ করিল, দগ্ধ করিল তাহার পিতা নৃপতি ক্রীয়নকে।

সভয়ে দেখিলাম জ্বলন্ত অগ্নিশিখা রাজপুত্রকে বেড়িয়ে ধরিয়া অনির্বাণ ক্ষুধায় জ্বলিতেছে। এলায়িত কেশে তাহার জ্বলিতেছে জলন্ত কিরীটি—সপত্নীকে মীডিয়ার উপহার। সভয়ে দেখিলাম তাহার মৃত্যুদহন, যেন বিবশ শ্রবণে আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল—"Ah me! Ah me!" ক্রীয়নের ধ্বংস দেখিলাম আর,—আর দেখিলাম রক্তাপ্লুত হস্তে ড্রাগনবাহিত রথে মীডিয়াকে. নিহত পুত্র-কন্যার পার্শ্বে ভূমিলুণ্ঠিত জেসনকে শুনিলাম বিলাপ করিতে। মীডিয়াকে ত্যাগ করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশোধ তাহাকে মীডিয়া দিয়াছে, স্বহস্তে নিজ পুত্রকন্যাকে হত্যা করিয়া। ঝড়ের গতিতে উদ্দাম রথ ছুটিয়া চলিল, সন্তানহন্ত্রী মীডিয়া অট্টহাস্য করিতেছে—সে উন্মাদ হাস্য। আজও যেন আকাশে বাতাসে তাহার মূর্চ্ছনা ভাসিয়া রহিয়াছে।

বিস্মৃতির সীমান্ত প্রদেশ হইতে কখনো কখনো সে হাসি বর্ত্তমান-যুগে চলিয়া আসে, মুহূর্ত্তের জন্য নারীকে পাগল করিয়া দেয়। ভুলাইয়া দেয় সভ্য জগতের পরিবেষ্টন, লজ্জাজড়িত ভীরুতা। আবার প্রত্যাখ্যানের বেদনা, প্রেমের বেদনার উর্ধ্বে জাগিয়া থাকে প্রতিশোধের বাসনা। শিরায় অনলশিখা নৃত্য করিয়া যায়, মুহূর্ত্তের বিক্ষোভে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ লুপ্ত হয়। পাপ পুণ্য সমস্ত কিছু অতলে রসাতল লাভ করে, বিশ্বজগতকে সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে আদিম প্রতিশোধ প্রবৃত্তি। যে প্রেম গৃহছাড়া করে, সেই প্রেমেরই প্রতিক্রিয়া এখনো প্রবল। মীডিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র ছাত্রী-আবাসে সন্ধ্যা ছয়টায় আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম। ঈশ্বর যখন ধার দেন নাই তখন ভাবের আবশ্যকতা বুঝিয়া অহোরাত্র নোটখাতা এবং ছোট অক্ষরে ছাপা পুস্তকের উপব ঝুঁকিয়া অবসর যাপন করিতাম। ইংরেজিতে এম. এ. পড়িতেছি বিদেশী-সাহিত্য অনুরাগিণী বলিয়া নহে, উপার্জনের সুলভ উপায় বলিয়া। আমার পিতৃবংশ সাতপুরুষে কেরানি, বাবা এখনও আসামে তাহাই করিতেছেন! সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর উর্ধ্বে আমার ধারণা উঠিত না। নিভৃত গৃহকোণে বসিয়া অধ্যয়নতপস্যা ভিন্ন বাইশ বছরের জীবনে আমার কিছু করিবারও ছিল না।

কিন্তু সেদিন ঘোলা জলের হ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষেপ হইল, দক্ষিণের বদ্ধ দ্বার খুলিয়া আমার টু-সীটেড্ রুমে মেট্রনের সহিত প্রবেশ করিল—সে!

অসাধারণ কিছুই সেদিন দেখি নাই আয়ত চক্ষু দুইটি ভিন্ন।

সে চক্ষে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা বাসা বাধিয়াছে। কেউটিয়ার কৃষ্ণ ত্বক্ অপেক্ষা তাহাদের কৃষ্ণতা আরো নিবিড়। দুর্লভ কালো হীরকখণ্ড কে যেন বাঙালী মেয়ের সাধারণ লালিত্যপূর্ণ সুশ্রী মুখে বসাইয়া রাখিয়াছে। কালো দুইটি কেউটিয়া! যেন চক্ষু দিয়াই সে কাহাকে মৃত্যু-দংশন করিতে পারে।

বব্ করিয়া ছাঁটা, তৈলবিহীন ঈষৎ সোনালী চুল নাচাইয়া সে আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আর সেই হাসির সহিত আমার নিঃসঙ্গ জড় চিত্তে সে একেবারে প্রবেশ লাভ করিল।

মেট্রন্ চারুশীলা হাজরা পরিচয় করাইয়া দিলেন—"এই তোমার রুম্‌মেট হোলো, শান্তি। তোমাদের ইয়ারেই ইতিহাসে ভর্তি হয়েছে ও। সব দেখিয়ে দিও-টিও।"

মেট্রন চলিয়া গেলে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি ভাই?"

হাতের অ্যাটাশে কেশ খুলিয়া সবুজ নরম চামড়ার একজোড়া চটি বাহির করিয়া সে চৌকিতে বসিয়া উত্তর দিল, "কঙ্কা।"

চকিতে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একটি নাম স্মৃতিপথে উদয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম "পদবীটা কি?"

নীচু হইয়া পায়ের ফিতা-বাঁধা হাঁটিবার জুতা খুলিতে খুলিতে অস্পষ্ট স্বরে কঙ্কা বলিল, "মণ্ডল।"

"তুমিই কি এবারে ইতিহাস অনার্সে ফার্স্ট হোয়েছো?"

মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা হাসিল—"হ্যাঁ।" সে হাসি আনন্দের বা গর্বের নহে, সে হাসি কৌতুকের।

প্রায় দুই মাস পরে একদিন দ্বারভাঙ্গা বিলডিং-এ চলিলাম

কঙ্কার সহিত দেখা করিতে। এক ঘরেই থাকি, তথাপি দুই-এক ঘণ্টার অবকাশ থাকিলে তাহারই কাছে যাইবার কথা মনে হয়।

তেতালায় মেয়েদের বসিবার অন্ধকার ও লম্বা ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লাল জুতা-পরা পদদ্বয় আন্দোলিত করিয়া কঙ্কা টেবিলে সমাসিন অবস্থায় তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম নিকটে টেবিল পাইলে সে কখনই চেয়ারে উপবেশন করিত না, আর যেখানেই সে উপবেশন করিত ধীরে ধীরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি জনতা গড়িয়া উঠিত।

আমাকে দেখিয়া মিমি দত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, "স্বাগতম্, এই যে শান্তি মিত্র রুমমেটের সন্ধানে এসে হাজির হয়েছে। নইলে দ্বারভাঙ্গা বিলডিং-এ আশুতোষ বিলডিং-এর মেয়ের পায়ের ধূলো পড়ে কদাচিৎ।"

কোণের ঈজিচেয়ারে অর্ধশায়িতা হলদে-ডুরে শাড়ী পরা কালো মেয়েটি টিপ্পনী দিল—"Mating instinct-টা ওঁর প্রবল দেখা যাচ্ছে।"

হাসি ঠাট্টায় বিব্রতপ্রায় আমাকে কঙ্কা সাদরে আহ্বান করিল, "এসো এদিকে শান্তি। এখন ছুটি বুঝি? বেশ হয়েছে, আমারও তাই।"

আমাদের হস্টেলের বরুণা প্রশ্ন করিল, "কঙ্কা, তুই কেন ইংরেজি নিলি না? তাহ'লে শান্তির এক পলের জন্য বন্ধু বিরহ সইতে হোত না? তুই তো ইংরেজিতে এত ভালো?"

কঙ্কা পরম তাচ্ছিল্যে উত্তর দিল, "সিলেবাসের বই খুলে

দেখলাম সমস্ত ইংরেজি বইগুলো বহুবার পড়া। তাই অত পড়া জিনিস আর পড়তে ভালো লাগলো না।”

কয়েকটি মেয়ে হাস্য গোপনের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আমি জানি কঙ্কা সত্য কথাই তাহাদের বলিতেছে। কঙ্কাকে শান্ত-নির্জীব বাঙালী মেয়েরা সহ্য করিতে পারে না। তাহার প্রখর বেশভূষা, মুক্ত ব্যবহার কিছুই তাহাদের প্রীতিদায়ক নহে। তবু তাহার সহিত আলাপ রাখিলে লাভ আছে। বি.এ-তে সে প্রথম হইয়াছে, হয়তো এম.এ-তেও হইবে। তাহার নিকট হইতে নোট্ সংগ্রহ করা এবং তাহার পঠনপ্রণালী শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। তদুপরি কঙ্কা মণ্ডলের ব্যয়কুণ্ঠাহীন আতিথ্য বিখ্যাত। তাই এই সব সুবিধা-বাদিনীরা গোপনে তাহার নিন্দামুখর হইয়া উঠিলেও প্রকাশ্যে তাহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিত। হীরকের উজ্জ্বলতা যে সকলকে আকর্ষণ করিবেই।

কঙ্কা অন্যমনস্কভাবে শিস্ দিয়া গান করিতে লাগিল। মেয়েরা কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবিবার পরে হলুদ-ডুরে ধারিণী বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “শিস্ দিচ্ছ কেন? এটা কো-এডুকেশনের কলেজ জানো না?”

তাহার তিক্ততাকে তাড়াতাড়ি ঢাকিবার জন্য মিমি দত্ত সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “শিস্ দিলে ভাই তোমার মা বকেন না?

উদ্ধত স্বরে উত্তর হইল, “মা-ই নেই। So what?”

কুটিল দৃষ্টিতে কঙ্কা মিমি দত্তের দিকে চাহিল। মিমি দত্ত অপ্রতিভ সুরে সান্ত্বনা প্রকাশের চেষ্টা করিল, “আহা আমি ভাই জানতাম না।”

“জেনেও দরকার নেই। শান্তি চলো বাড়ী যাই।”

চিতাব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতায় কঙ্কা মেঝেতে নামিল।

বরুণা সবিস্ময়ে বলিল, "ওকি, চারটের সময় যে 'এ-কে-আর'-এর ক্লাস?"

"আজ পড়্‌তে ইচ্ছা করছে না। আমি চল্‌লাম।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কঙ্কার লাগেজপত্রে আমাদের ছোট ঘরটি ভরিয়াও সঙ্কুলান হয় নাই। বিস্তর বকাবকি করিয়া মেট্রন্‌ অবশেষে পাশের বারান্দা ঢাকিয়া বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

টেবিলের দেরাজ হইতে চকোলেটের বাক্স বাহির করিয়া একটি নিজের মুখে দিয়া কঙ্কা বাক্সটি আমার দিকে ঠেলিয়া দিল। আমাদের দুইজনের চৌকীর মধ্যে সে একটি বড় আয়না লাগাইয়াছে। সেই দর্পনে আমাদের উভয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

দেখিলাম তাহাকে—প্রাণমদিরায় উচ্ছ্বসিত, পূর্ণযৌবন সুগঠন দেহ। সে সৌন্দর্য উগ্র, কিন্তু পরিপুষ্ট অধরে, হ্রস্ব চিবুকে অনন্ত কোমলতা। পূর্বে লক্ষ্য করি নাই এখন দেখিলাম দীর্ঘ গ্রীবা তাহার রজনীগন্ধার দণ্ডের মত সরল, অলকগুচ্ছ আঙ্গুরের শোভনতায় দোদুল্যমান। অতি পাশ্চাত্য বেশভূষা ও ভাবভঙ্গি তাহার লীলাময় সারল্যে বিন্দুমাত্র বন্ধন দিতে সক্ষম হয় নাই।

দেখিলাম নিজেকে—নিষ্প্রভ, ভীরু-দৃষ্টি; স্বাস্থ্যহীন, ক্ষীণ দেহ; ব্রণলাঞ্ছিত, ভাবলেশশূন্য মুখমণ্ডল। বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা, আনন্দহীন চিত্ত শৃঙ্খলের কঠোরতায় যৌবনকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ওই লীলাপ্রতিমার উপযুক্ত সঙ্গিনী বটে! দুইখানি চিত্তের অসমতায় হৃদয় ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু, তাইতো কঙ্কাকে এত ভাল বাসিয়াছি! আমি জীবনে যাহা হইতে পারিলাম না,

অথচ যাহা চিরদিন আমার মানসস্বপ্ন ছিল—তাহাই কঙ্কা আমার চোখের সম্মুখে মূর্তি ধরাইয়া দেখাইয়া দিয়াছে। আমি যাহা হইতে পারিব না কঙ্কা তাহাই। তাইতো কঙ্কাকে এত ভালবাসি! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, অত সুন্দর চুলগুলো কেটে ফেলছ কেন কঙ্কা?

পরম তাচ্ছিল্যে কঙ্কা উত্তর দিল, কি হবে চুল রেখে? তেল দাও, চুল আঁচড়াও, বাঁধো! তার ওপর পিঠের উপরে পড়ে গা সির্-সির্ করে। এই ভালো।" কঙ্কা মাথা ঝাঁকাইয়া উচ্চস্বরে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। চারিপাশের দেওয়ালগুলিতে সে হাসি বন্দীর ব্যর্থতায় আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিল। আয়নার দিকে তাকাইয়া চিন্তিত স্বরে কঙ্কা বলিল, "চুল কি আজ কেটেছি? সিস্টার বেথেল নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি মাত্র।"

"সিস্টার বেথেল কে?"

"যে মিশনারি স্কুলে আমি পড়তাম, তারই কর্ত্রী।"

"সত্যি, বাইরের ইস্কুল-কলেজ থেকে এত ভাল করা কঠিন। বি.এ-ও তো ওখান থেকে দিয়েছিলে?

"হ্যাঁ।" কঙ্কা চুপ করিয়া রহিল। কেন জানি না, বাড়ীর কথা সে কখনো বলিতে চাহিত না। এক ঘরে থাকিয়াও তাহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য ছিল। মাতাপিতা-হীন, পিসিমা ও পিসেমহাশয় তাহার অভিভাবক। পিতা তাহার জন্য অর্থ ও ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, মাসে মাসে পিসিমা তাহাকে সেই টাকা পাঠান। তাহার অন্য কোনও ভাইবোন নাই। পাবনা জেলার এক গণ্ডগ্রামে তাহার পৈত্রিক নিবাস। এইটুকু অনেক

চেষ্টায় জানিয়াছিলাম। বড় ইচ্ছা হইত তাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিতে। কিন্তু সে কেন জানি না, স্বীয় স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরব থাকিত। তাই, আমিও আজও নীরব রহিলাম।

বন্ধ জানালাটা সহসা সজোরে ধাক্কা দিয়া খুলিয়া কঙ্কা উগ্র স্বরে বলিল, "কি বিশ্রী ঘরটা! এইটুকু ঘরে তুই বছর ধরে আছ কি করে?"

অপমান বোধ হইল, বলিলাম, "এর চেয়ে ভালো হস্টেলের অভাব নেই কলকাতায়। অপচ্ছন্দ হলে সেখানে গেলেই পারো?"

আশ্চর্য সে! একটুও বিরক্ত হইল না। উত্তাপশূন্য হাস্যে উত্তর দিল, "পিসি যা কিপটে! যে টাকা পাঠায়, ওসব দামী হস্টেলে থাকলে, অন্য খরচ করব কি?"

"সে কি কঙ্কা, তোমার তো যথেষ্ট টাকা আসে।"

কঙ্কা মুখ ভেংচাইল—"যথেষ্ট! ভারী যথেষ্ট। ওতে কি হবে আমার? কলকাতা যা মজার জায়গা, রাস্তায় বার হলেই খরচ করতে ইচ্ছে হয়। জানো, আমি আগাগোড়া যা স্কলারশিপ পেয়েছি সমস্ত জামা কাপড় কিনে খরচ করে ফেলেছি। পিসি বকে, বলে যে ঠিক বাপের ধারা ধর্‌ছে মেয়ে।" কঙ্কা গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া গেল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করিবার জন্য বলিলাম, "এই পাড়াগাঁতে জন্মেও অতদূর পড়েছ সেটাই আশ্চর্য। তোমাকে দেখে কিন্তু মনেও হয় না পৃথিবীর কোন পল্লীগ্রামের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।" অনিচ্ছুক ভাবে কঙ্কা বলিল, "আগাগোড়া যে আমি মিশনারি মেমদের কাছে তাঁদের বাড়ীতে মানুষ হয়েছি,

পড়াশোনায় ফল ভালো করলাম, তাঁরাও খুব চেষ্টা করেছিলেন, তাই এতদূর পড়া হয়েছে।”

“তোমার মা-বাবা বুঝি তোমার অল্প বয়েসে মারা গেছেন কঙ্কা ?”

তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা বলিল, “হ্যাঁ। তুমি বড় বাজে বকো।”

অজানিতে তাহাকে বুঝি আঘাত দিলাম! জানি আঘাত তাহাকে ম্রিয়মান করে না, করে ক্ষিপ্ত। কথার মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলাম, “আচ্ছা, কাজের কথাই হোক তা হ’লে। বিয়ে-টিয়ে করবে না ?”

কঙ্কা হাসিল—“করবো হয়তো। বিয়ে করবার উপযুক্ত পুরুষ তো একটিও দেখলাম না।”

“কি রকম চাও তুমি ?”

কুটীল’ নয়নে কঙ্কার স্বপ্নের ছায়া নামিল—“কি চাই জানি না। যা চাই তা না দেখলে বুঝতেও পারবো না। কি জানি!” অনেকক্ষণ সে কি যেন ভাবিবার প্রয়াস করিল। অবশেষে বিফল প্রয়াস ছাড়িয়া দিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, “তুমি বিয়ে করবে না ?”

এ কথা ভাবিবার অবকাশ নাই আমার। আমার পরে আরো চারিটি বোন। কোনক্রমে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া বাবাকে মুক্তি দিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষার কিয়দংশ ভার লইতে হইবে। আমার ব্যবস্থা ? বদ্ধ শিক্ষাসদনে প্রাহরিক চীৎকার, রজনীতে নিঃসঙ্গ শয্যা।

বলিলাম, “আমার মত কদাকারকে কে বিয়ে করবে ভাই ?”

কঙ্কা সবিস্ময়ে কি হেন বলিতে যাইয়া আমার মুখের দিকে

চাহিয়া থামিয়া গেল। নিজের বিছানা হইতে উঠিয়া চকোলেট্-মাখা হস্তে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "Never mind, ছেলেদের ছাড়াও আমাদের দিন বেশ চলে যাবে।"

সন্ধ্যার পর আমার টেবিলে বসিয়া গ্রীক্ নাট্যকার ইউরিপিডিসের 'মীডিয়া' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ পড়িতেছিলাম। বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়া আমাকে না লইতে পারিয়া কঙ্কা অন্য মেয়েদের লইয়া তিনটার শো'তে সদ্যাগত 'হ্যামলেট ছায়াচিত্র' দেখিতে গিয়াছে। শেক্স্পীয়রের 'হ্যামলেট' আমার পাঠ্য তালিকায় পড়ে না, অথচ কাল ক্লাসিক্সের ক্লাসের টিউটোরিয়াল। সুতরাং যাই নাই। কঙ্কার পড়াশোনোর প্রয়োজন নাই, পুস্তকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইলেই তাহার চলিবে। কিন্তু আমার আছে। বিড়্বিড়্ করিয়া মুখস্থের ভঙ্গিতে পড়িতেছিলাম :—

"Heard ye not all she said, with a loud voice invoking Themis, who fulfils the vow, and Jove, to whom the bribes of men look up as guardian of their oaths. Medea's rage can by no trivial vengeance be appeased."

বিদ্যুৎগতিতে ঘরে ঢুকল সে—পা হইতে মাথা পর্যন্ত কালো বস্ত্র তাহার, দু'একটি কালো কাঁচের গহনা। কাঁধের উপর শ্যাম্পুস্ফীত চুলগুলি বিষধরের ভীষণতায় আস্ফালন করিতেছে। আর তাহার চোখ? উত্তেজিত, মত্ত! জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন লাগলো?"

"আঃ, চমৎকার!" চেয়ারে বসিয়া তিন ইঞ্চি উচ্চ কালো কোর্ট্শু খুলিতে খুলিতে কঙ্কা বলিতে লাগিল, "ফ্রেডেরিক মার্শকে

করেছে হ্যামলেট, বেসিল্ র‍্যাথ্‌বোনকে কাকা, এলিসা ল্যাণ্ডি হয়েছে হ্যাম্‌লেটের মা। আর ওফেলিয়া নর্‌মা শিয়ারার্। সকলেই ভালো অভিনয় করেছে, বিশেষতঃ হ্যাম্‌লেট। শেষ দৃশ্যে যখন কাকাকে ছুরি মারছে—" কঙ্কা সহসা বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আবার পুস্তকে মন দিলাম।—

"—Accost her not, beware of those ferocious manners and the rage, which boils in that ungovern-able spirit."

"কি দিনরাত পড় তুমি! আমার হাত হইতে বইখানা কঙ্কা আবার ঘরে ঢুকিয়া টানিয়া লইল—"কি বই এটা? মীডিয়া! ও সেই আধপাগল মেয়েটার কথা? ভয়ানক মেয়ে! স্বামীকে জব্দ করবার জন্য নিজের হাতে নিজের ছেলেমেয়েকে হত্যা করলো।"

চকিতে বইখানা কঙ্কা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিল—"সব এক ব্যাপার নিয়ে! খুন, জখম, রক্তারক্তি! দেখে এলাম হ্যাম্‌লেট, সে-ও তাই, এখানে তুমি খুলে বসেছো মীডিয়া, এ-ও তাই। যত সব!" ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে কঙ্কা ঘরের মধ্যে ফিরিতে লাগিল।

"কি হয়েছে তোমার কঙ্কা, আজ?" বইখানা কুড়াইয়া লইলাম।

"কি জানি! ওই সব দেখলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই! কেমন যেন ভেতর থেকে অস্থির লাগে আমার!" কঙ্কা বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সেদিন রাত্রে কঙ্কা বিশেষ আহারাদি করিল না। তাড়াতাড়ি

আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। অনেক রাত্রে পড়াশোনা শেষ করিয়া রাত্রি জাগরণের সাক্ষী মোমবাতিটি নির্বাপিত করিবার পূর্বে একবার কঙ্কার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। সে গভীর নিদ্রামগ্ন। চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে তাহার মুখখানি আমার আরো ভাল লাগে। ওই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক দুটি চোখকে সময়ে সময়ে আমিও ভয় করিতে শিখিয়াছি।

গভীর স্নেহে কতক্ষণ চাহিয়া ছিলাম জানি না। কঙ্কার অস্ফুট নিদ্রাজড়িত স্বরের দুটি স্বগতোক্তি আমার চেতনা আনিয়া দিল—"তারা, তারা!"

পরের দিন প্রাতে রসিকতা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারি নাই—"যতই না কেন মেমসাহেব হও কঙ্কা, হিন্দুর মেয়ে তো, রাতে ঘুমের ঘোরে দেবদেবী নামটাই তো মুখে এল!"

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা বলিল "কি নাম?"

"বলেছিলে তারা তারা!"

সবেগে আমাকে নাড়িয়া কঙ্কা উত্তেজিত স্বরে বলিল—"কি? কি? আর কি বলেছিলাম?"

বিরক্ত হইলাম—"এতে অত অস্থির হচ্ছ কেন? লজ্জার তো কিছু নেই ঠাকুর-দেব্‌তার নামে। আর আবার কি বল্‌বে? তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম তো ঘুমের মধ্যে নেওয়া যায় না।"

কঙ্কা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক দ্রুততায় উত্তর দিল, "তা হবে!"

সেদিন একটায় ছুটি হইল, ছেলেদের টেনিস্ টুর্নামেণ্ট্। আমাদের বরুণার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই জয়ন্ত চৌধুরী

দলপতি। বরুণার প্ররোচনায় আমরা কয়েকজন খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম।

জয়ন্ত ষষ্ঠবার্ষিক ইংরেজির ছাত্র। গতবছর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার পরে সে আবার পড়িতেছে। নিখুঁত সৌন্দর্য এবং অনন্যসাধারণ ক্রীড়াকৌশল ভিন্ন বিশেষ কিছু তাহার ছিল না। কিন্তু, সুগঠিত শরীরে ক্রীড়া উপযোগী পোশাক পরিয়া যখন সে খেলার মাঠে কর্তৃত্ব করিত, তখন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক নারীর বক্ষে বিস্ময় ও আনন্দের দোলা লাগিত!

নেটের কাছে জয়ন্ত খেলিবার সাদা পোশাকে দাঁড়াইয়া মনোযোগ সহকারে হাতের র‍্যাকেট্‌খানি দেখিতেছিল। গায়ে তাহার নীল খেলোয়ারের কোট। নভেম্বর মাসের রৌদ্রতাপে গৌরবর্ণে সূর্যের রক্তিম দাক্ষিণ্য। অতিকুঞ্চিত নিগ্রোসুলভ কেশ রৌদ্রকরপাতে জ্বলিতেছিল—golden fleece! সহসা জেসনের প্রার্থিক সুবর্ণময় মেষরোমের কথা মনে হইল। আশ্চর্য!

ব্যগ্র আগ্রহের সহিত খেলা দেখিতে দেখিতে কঙ্কা বলিল, "দেখবে, ওই সুন্দর ভদ্রলোকটি নিশ্চয় জিত্‌বেন।"

আমি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "উল্টো দিকে রঞ্জিত রায়, জেতা মুশকিল।"

হাতের ক্ষুদ্র রুমালখানিকে নির্দয় পীড়ন করিতে করিতে নিশ্চিত কণ্ঠে কঙ্কা বলিল, নিশ্চয় উনিই জিত্‌বেন। জিত্‌তে ওঁকে হবেই।" তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া গায়ের মধ্যে শির্‌শির্ করিয়া উঠিল। কালো দুইটি কেউটিয়া ফণা ধরিয়া রহিয়াছে!

খেলা শেষ হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমাদের ছোট ঘরটিতে ফিরিয়া গলা হইতে মাফ্‌ খুলিতে খুলিতে বলিলাম—

"বিজয়ী বীরকে কেমন লাগ্‌লো কঙ্কাদেবীর ? বরুণা তো আলাপ করিয়ে দিল দেখলাম।"

"কেমন লাগ্‌বে মানে কি ? এ কি রসগোল্লা সন্দেশ, যে চেখে দেখে বল্‌ব ?" কঙ্কা বিছানায় এলায়িত ভঙ্গিতে অর্ধশায়িত হইল।

"তা যে ভাবে তুমি জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকাচ্ছিলে তা'তে মনে হচ্ছিল সন্দেশ রসগোল্লার চেয়ে লোভনীয় কোনও বস্তু থাক্‌লে সে তাই।"

কঙ্কা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিল।

শীতকালে গলার পীড়ায় প্রায়শঃ ভুগি। টন্‌সিল্‌-সেবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। কঙ্কা নিরুত্তরে দূর সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। ফিরিবার পথে ট্রামে তাহার অন্যমনস্ক বিষাদ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সমস্ত দিনের উৎসাহ উত্তেজনা তাহার কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে! উগ্র বিষধর চক্ষু মন্ত্রমুগ্ধ নির্বীর্যত্বে যেন ঘুমন্ত। কত যুগান্তের স্বপ্ন দেখিয়া যেন তাহারা উঠিয়া আসিল।

গরম জলে গলা ধৌত করিবার জন্য শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া কঙ্কাকে বলিলাম, "ধন্য তোমার ইচ্ছাশক্তি কিন্তু। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তকে জেতালে তবে ছাড়লে। যে ভাবে তুমি চীয়ার করেছিলে উনি পয়েণ্ট পাওয়া মাত্র, তাতে ওঁর তোমার উৎসাহেই জেত্‌বার কথা। মাঝে মাঝে তোমার দিকে তাকাচ্ছিলেন উনি, দেখছিলে না ?"

কঙ্কা উঠিয়া বসিল—"আমি জানি উনি জিত্‌বেন। আচ্ছা, উনি বরুণার কি রকম ভাই হন জানো ?"

জলের উত্তাপ সাবধানে পরীক্ষা করিতে করিতে উত্তর দিলাম,

"কি জানি বরুণা তো 'কাজিন' বলে। দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই শুনেছি। বাবা আবার বিয়ে করেছেন, তাই ওঁর মা ওঁকে নিয়ে ভাই-এর বাড়ি থাকেন। ভাই-এরা বেশ বড়লোক, কিন্তু গলগ্রহ তো? জয়ন্ত আবার গতবছর ফেল করে মাটি করে বসেছেন। আর এক বছর মামাদের খরচ চালাতে হবে তো। বাবা তো ওঁদের কোন খবরই রাখেন না।" সাবধানে গরম জলের পাত্রটি ধরিয়া বাথরুমে চলিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি কঙ্কা সেইভাবেই বসিয়া আছে। আমি ঘরে ঢুকিবামাত্র সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা তাহলে ভদ্রলোক কি জাত?"

বুঝিলাম এতক্ষণ জয়ন্ত চৌধুরীর সবল দেহ ও সামান্য মুখচ্ছবি কঙ্কার মনে নানা ক্রিয়াকলাপ করিতেছিল। হাসিয়া বলিলাম, "কেন, ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বরুণা যে বাগচী।"

কঙ্কার চক্ষে নিবিড় ভীতির ছায়া নামিয়া আসিল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে সে নিজের মনে উচ্চারণ করিল—"বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ!"

বেশিদিন নহে। পরের দিনই সন্ধ্যায় জয়ন্ত দর্শনপ্রার্থী হইল হস্টেলের ভিজিটর্স রুমে। গোধূলির অন্ধকারে কথাবার্তা শেষ করিয়া কঙ্কা উপরে ফিরিয়া আসিল। মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তখনো আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসি নাই। নিঃশব্দে কঙ্কা তাহার বিছানায় বসিল। ধূসর চীনাংশুক তাহার পরিধানে, পুরাআস্তিন কালো ক্রেপ-ডি-শীন্‌এর জামা। হঠাৎ আবছা আলোতে তাহাকে কেন জানি না বড় অসহায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার চক্রান্ত করিয়াছে যেন তাহার ধূসর মূর্তিকে গাঢ় কালিমায় অবলুপ্ত করিয়া দিবে। কিন্তু হাল্কা অন্ধকারকে পরাজিত করিয়া জ্বলিতেছে

তাহার চক্ষু দুইটি। তাহারা যে আরো কালো, আরো গভীর! কোথা হইতে কি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, কিসের সহিত যেন অবিরাম তাহার যুদ্ধ চলিয়াছে। সেই সব শক্তির বিরুদ্ধে যে একা। সে অসহায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "জয়ন্ত চৌধুরী এসেছিলেন দেখা করতে?" কঙ্কা উত্তর দিল, "ওঁরা টেনিস গ্রাউণ্ডে মেয়েদের খেলবার ব্যবস্থা করতে চান। আমি আগে টেনিস্ খেলতাম। বরুণার কাছে শুনে তাই আমার কাছে এসে ভার নেবার জন্য বললেন। কাল সেক্রেটারির কাছে মিস্টার চৌধুরী এ বিষয়ে প্রস্তাব করবেন। তিনি যা বলেন কাল আমাকে জানিয়ে দেবেন।" কঙ্কা কথা শেষ করিয়া টেবিলের কাছে উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া লঘুস্বরে গান ধরিল, "I ain't nobody's darling."

পরিহাস করিলাম—"এখন কে কার 'ডালিং' হয় বলা শক্ত।"

সাধারণ পরিহাস। কিন্তু ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা অগ্নিবর্ষণ করিল—"তুমি বড়ো বাজে বকো, শান্তি।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের ধাক্কায় তাহারই আনীত রক্তগোলাপগুচ্ছ ফুলদানী হইতে মেঝেতে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হইল।

সঙ্কুচিত হইয়া রহিলাম।

ছাত্রীদের পরিচালিত ছাত্রী-আবাস। নিজেরাই ব্যবস্থা করে, নিজেরাই কর্ত্রী। চারুশীলা হাজরা মেট্রন, কিন্তু তিনিও মাত্র বছর দুই পূর্বে পাস করিয়া শিক্ষাদান করিতেছেন। সুতরাং, শাসনের অবসর নাই, কড়াকড়ি নিয়মেরও একান্ত অভাব। কঙ্কা ও জয়ন্তের ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি করিবার কেহই নাই। তাই,

জয়ন্তের সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ প্রাত্যহিক হইবার নির্বিবাদ অবকাশ পাইল।

একদিন দেখিলাম কঙ্কা জয়ন্তের সহিত মুভিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিরুনি ও সুগন্ধি লোশানের সাহায্যে সে বিদ্রোহী অলক-গুচ্ছকে বশে আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। বলিলাম, "দেখো কঙ্কা, সাবধান। এটা মার্চ মাস, জুলাইতে জয়ন্তের পরীক্ষা। শেষে আবার না এবারেও ফেল করেন।"

কঙ্কা নিশ্চিন্তভাবে হাসিল—"আরে না, না। সেই জন্যই তো আমি নিজে জয়ন্তকে পড়াশোনায় সাহায্য করছি। ওর বইগুলো সব পড়ে নিচ্ছি, তারপর সেই গুলো ওর সঙ্গে আলোচনা করে করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

আশ্চর্যে বলিয়া উঠিলাম, "ও হরি! তাই আজকাল ইউনি-ভার্সিটি থেকে ফিরে অত তোমার বই পড়ার ঘটা দেখি? আমি ভাবি তোমার বোধহয় সুমতি হয়েছে, নিজের কাজই করছো। তা না, এই সব বেগার ঠেলা! অনর্থক ইংরেজি বইগুলো পড়ে সময় নষ্ট করছো। নিজের ভবিষ্যৎটা ভাবো এখন।"

কঙ্কা অবহেলার সহিত উত্তর দিল, "আমার তো এখনো এক বছর দেরি আছে। জয়ন্তের তো এসে গেল। ওর আবার কেউ আলোচনা ক'রে না বোঝালে মনে থাকে না। একা একা পড়তে ওর মন লাগে না। আর, খেলাতেই ওর মাথাটা খোলে বেশি।"

সহাস্যে বলিলাম, "সেজন্যে কোনো পক্ষেই তো কোনও ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে না।"

কঙ্কা একবার আমার দিকে চাহিয়া হাসিল, সুখের হাসি।

বুঝিলাম চিরদিন নারী পুরুষের মধ্যে যে রূপ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, যে রূপকে সে আদিম কাল হইতে ভাল বাসিয়াছে, কঙ্কা জয়ন্তের মধ্যে সেই রূপই দেখিয়াছে। সে রূপ—বীরের।

গাঢ় সবুজ পোশাকের এখানে সেখানে, চুলে, কানের পিঠে, সর্বত্র কঙ্কা পরম তাচ্ছিল্যের সহিত স্প্রে দ্বারা ফরাসী পুষ্পসার বিতরণ করিল। রক্তিম রঞ্জনী ওষ্ঠাধরে বুলাইয়া ভ্রূ-তুলিকার সাহায্যে চক্ষু দুইটি আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিল। হাতে রূপার তারে গাঁথা হাতব্যাগ লইয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাত তুলিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিল, আচ্ছা "Cheerio"। কঙ্কার অপসৃয়মাণ মূর্তির প্রতি চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম। প্রথম দিনের বিরক্তি ক্রোধ আজ আর তাহার কিছুই নাই। বিষণ্ণ অন্যমনস্কতাও অন্তর্হিত। পুলক-সৌন্দর্য্যে আজ সে উদ্বেলিত তটিনীর মত যৌবন বন্যায় কুলপ্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কোনো দ্বিধা সংশয়ের চিহ্নমাত্রও নাই। নিয়তিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে আত্মসমর্পণ ভিন্ন উপায় কোথায়? কিন্তু মণ্ডল ও চৌধুরী? জানিনা এ প্রেমের পরিণতি সুখাবহ হইবে কিনা।

দিন চলিয়া যায়। কঙ্কা-জয়ন্তের অনুরাগ-কাহিনী শাখা পল্লবে রূপায়িত হইয়া ছাত্রছাত্রী মহলে গল্পের বস্তু হইয়া উঠিল। একাগ্রতায় কঙ্কার নবরূপ দেখিলাম। অদম্য উৎসাহে জয়ন্তকে পরীক্ষা-বৈতরণী পার করিতে সে ব্যস্ত। এম্‌.এ. পাস করিয়া জয়ন্ত মাতুলাশ্রম ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জনে মন দিবে। গৃহহারা সে গৃহ বাঁধিবে, আর বোধ হয় গৃহলক্ষ্মী হইবে কঙ্কা। উদ্দীপ্ত বহ্নিশিখা গৃহ-দেউলে জ্বলিবে প্রদীপের স্নিগ্ধতায়। যে অজানা

জ্বালা তাহার নয়নে, যে রহস্তময় দহনে সে সর্বদা অস্থির, তাহার কি নির্বাণ হইবে পুরুষের প্রেমে ?

আমার বাৎসরিক পরীক্ষা আসিয়া গেল। বাধ্য হইয়া চারি বছর পূর্বে পাসকরা এক বেকার যুবককে শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম। সুতরাং জয়ন্ত-কঙ্কার একতালার ভিজিটর্স রুমের সম্মুখে আর একটি ভিজিটর্স রুম বৈকালে আমি দখল করিলাম। ভালোভাবে পাস আমাকে করিতেই হইবে।

প্রেমালাপের পালাগানের অংশ মাঝে মাঝে কানে ভাসিয়া আসিত পর্দার অন্তরাল হইতে। কখনো স্বর নিম্ন কখনো উচ্চ।

সেদিন দোতলা হইতে বার্কের 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন' বইখানা আনিতে যাইবার পথে কঙ্কাদের ঘরটির সম্মুখে দাঁড়াইলাম অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া।

তিরস্কারের বিরক্তস্বরে জয়ন্ত বলিতেছে শুনিলাম, "দেখতো কি করলে ? জীবজন্তুর মত দাঁত দিয়ে কামড়াও কেন ?"

উত্তেজিত চাপা স্বরে কঙ্কা বলিল, "কেন তুমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার হাত ধরলে ?"

বিদ্রূপের সহিত উত্তর শোনা গেল, "ধরা তুমি যেন দিতেই জানো না ? সেদিন শিবপুর বাগানের কথা মনে আছে ?

"চুপ করো, সেদিন আমার ইচ্ছা হয়েছিল, আজ ইচ্ছা নেই। You should never force me to anything."

জয়ন্তর উত্তর শোনা গেল না। আর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া উপরে চলিয়া আসিলাম। ঘোলা জলের হ্রদেও আন্দোলন উঠিয়াছিল। আমারই ভীরু দৃষ্টির সামনে মানবমনের এক প্রাগ্-ঐতিহাসিক প্রবৃত্তির সম্যক বিকাশ

দেখিলাম। চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করিয়া ডেস্ক্ খুলিয়া বই বাহির করিতেছি, সে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"শান্তি, তোর আইওডিনের শিশিটা দেখি তাড়াতাড়ি, আর একটু তুলো।" নিরুত্তরে শিশি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে হঠাৎ তাহার কাশ-শুভ্র বস্ত্রাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। সামান্য খানিকটা স্থান রক্তরঞ্জিত। কঙ্কা তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, অজ্ঞাতে মৃদুস্বরে ক্ষেদোক্তি করিয়াছিলাম।

সহজ কণ্ঠে কঙ্কা বলিল, "পেন্সিল কাটতে গিয়ে ছুরি লেগে জয়ন্তের হাতের কব্জী কেটে গেছে। প্রথমে কাপড় দিয়ে ধরেছিলাম। এখন দেখছি একটু বেশি কেটে গেছে।" দ্বার পথে কঙ্কা আমার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। ইস্পাতের মত প্রখর, উজ্জ্বল হাস্য। আবার মনে হইল তাহার চক্ষু দুইটি বড় অস্বাভাবিক।

আমার পরীক্ষা হইয়া গেল। জয়ন্তর পরীক্ষাও শেষ হইল। সে মাতুলদের সহিত তাঁহাদের দেশের বাটির পূজা উপলক্ষে চলিয়া গেল। পরীক্ষার বৎসর বলিয়া আমি রহিলাম। কঙ্কা গেল না, কোথাও নাকি তাহার যাইবার স্থান নেই। কঙ্কাকে বলিলাম, "জয়ন্ত তো সেকেণ্ড্ ক্লাস্ পেলেন। গুরু-দক্ষিণাটা কি দেবেন ?

বিছানায় শায়িত অবস্থায় কঙ্কা 'Gone with the Wind' পাঠ করিতেছিল। আলস্য-জড়িত স্বরে বলিল, "নিজেকে দিয়েই রেখেছে। I am sick and sullen. My Antony is away."

বলিলাম, "ধন্য আধুনিকা ক্লিওপ্যাট্রা। কিন্তু অ্যাণ্টনি ঠিক থাকবে তো ?"

"না থাকবার কারণ কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

তাহার স্মৃতিমগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া এতদিন মনের মধ্যে যে কথা তোলপাড় করিতেছিল দ্বিধার সহিত তাহাই প্রকাশ করিলাম—"কিন্তু মণ্ডল-চৌধুরী! বিয়ে আটকাবে না তো?"

"কেন আটকাবে?" কঙ্কা বই ফেলিয়া উঠিয়া বসিল—"আমি জাত মানি না। ও সব আজকাল কেউ মানে না।"

"কিন্তু, যদি এ বিয়ে সুখের না হয়?"

"কি বলছো শান্তি। একবার ট্রাজেডি হয়েছে বলে কি প্রত্যেক বারই তা-ই হবে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়, কোনো কিছুরই শক্তি থাকে না মানুষের জীবনে ছায়া ফেল্‌বার।"

কোনো অজানা রহস্যের আভাস পাইয়া প্রশ্ন করিলাম—"একবার কি ট্রাজেডি হয়েছে?"

উত্তেজিত, উগ্রস্বরে কঙ্কা বলিল, "কিছু না। শোনো শান্তি, জয়ন্ত ব্রাহ্মণ বলেই জয়ন্ত যেন আমাকে আরো বেশি আকর্ষণ করছে! দেশে আমাদের ঘরে ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে পূজা করে। সেই ব্রাহ্মণের ভালবাসা! আমি তার সঙ্গে সমান হবো! চিরদিন ছোটজাত বলে অবজ্ঞা পেয়ে এসেছি। এবারে তার শেষ হবে।"

হাসিয়া বলিলাম, "The fruit of that forbidden tree, নয় কি? তাই তোমার মোহ আরো প্রবল হয়েছে। কিন্তু, তুমি বড় বেশি বল্‌ছো কঙ্কা। ব্রাহ্মণ কায়স্থে পার্থক্য তেমন বেশি নয়। কায়স্থকে পাড়াগাঁতেও ছোট জাত বলে না কেউ। তুমি তো কায়স্থ।"

সতর্ক সর্পের দৃষ্টিতে চাহিয়া কঙ্কা বলিল, "না, ব্রাহ্মণ কায়স্থে অত পার্থক্য সত্যি নেই।"

বলিলাম, "সুতরাং সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু জয়ন্ত আসছেন কবে ফিরে? আমাদের কলেজ খুল্‌বে তো দু' একদিনের মধ্যে।"

কঙ্কা উদাস ভাবে উত্তর দিল, "জয়ন্ত আজ চিঠি লিখেছে দিন দশেকের মধ্যেই ফির্‌ছে।"

কথাটা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। শুনিলাম বরুণা ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের বলিতেছে। শরীর খারাপ বলিয়া কঙ্কা সেদিন হস্টেলে ছিল ইউনিভার্সিটিতে আসে নাই।

বিবাহের কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। জয়ন্ত কিছুদিন হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এখনো কঙ্কার ভবনে সে নিয়মিত যাত্রী। ভাবিলাম হয়তো কঙ্কার সহিত এ বিষয়ে তাহার কোনও কথা হইয়াছে।

লাইব্রেরি হইতে চসারের উপরে একখানা বই ধার করিয়া হস্টেলে প্রায় চারিটার সময়ে ফিরিলাম।

নীল বিছানার উপরে শুইয়া কঙ্কা, 'Gone with the Wind' বইখানি শেষ করিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাথা ধরাটা ছেড়েছে কঙ্কা? নিরানব্বুই-এর উপরে জ্বর আর ওঠেনি তো? ওবেলা জেদ করে স্নান করলে এর ওপরে!"

বইখানা মুড়িয়া কঙ্কা আমার দিকে চাহিল—"না জ্বর আসে নি, কিন্তু মাথার যন্ত্রণা আর শরীরে জ্বালা রয়েছেই। স্নান না করে কি করি? জ্বর হলেও স্নান আমায় করতে হয়, নইলে শরীর ভয়ানক গরম হয়ে যায়। ওবেলা ভয়ে ভয়ে সামান্য একটু জল খরচ করেছি, এখন গা-মাথা দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে।

ঝি ট্রেতে করিয়া লুচি-তরকারি এবং চা আনিয়া দিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলিলাম, "তুমি চা খাবে না?" কঙ্কা হাসিল—"আমার আর আজ খেয়ে কাজ নেই। একেতেই গরমে অস্থির লাগছে।"

আহার্যে মন দিয়া বলিলাম আজ একটা কথা শুনলাম ইউনিভার্সিটিতে।"

"কি কথা?"

ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "জয়ন্তের বিষয়ে।"

ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে কঙ্কা চাহিল—"জয়ন্তের বিষয়ে, কি?"

"বরুণা বল্‌ছিল জয়ন্তের নাকি বিয়ের ঠিক হচ্ছে। ওঁর মামার বাড়ির দেশের জমিদারের মেয়ে। বিয়ের পর তাঁরা জয়ন্তকে ইংলণ্ড পাঠিয়ে কাজকর্ম করে দেবেন।"

কঙ্কা তীর বেগে উঠিয়া বলিল—"কী? জয়ন্তের বিয়ে!"

তাহার দিকে চাহিয়া ভয় পাইলাম। মুখ আরক্ত, রুক্ষ-বিক্ষিপ্ত কেশগুচ্ছ—আর দুইটি চক্ষু? কুণ্ডলীকৃত কেউটিয়া তীব্র আক্রোশে ফণা ধরিয়া উত্থিত হইয়া দংশন করিবার জন্য দুলিতেছে। মানবীর চক্ষে এমন অদ্ভুত সর্পীর দৃষ্টি! মনে হইল এই কঙ্কাকে আমি চিনি না—হাস্যমুখরা সাবলীল লীলাসঙ্গিনী আমার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এই অর্ধ উন্মাদ নারী যে কোনও কাজই করিতে পারে।

সভয়ে বলিলাম, "বরুণা এমনি হয়তো বলছিল। আমার মনে হয় বাজে কথা। আজ তো জয়ন্ত সন্ধ্যায় আসবেন। তুমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো।"

সন্ধ্যায় জয়ন্ত আসিল। কঙ্কা আজ বেশভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্যসাধন করিল না। তাহার পশ্চাতে আমিও কিছুক্ষণ

পরে আসিয়া সামনের ঘরটিতে একখানি বই হাতে করিয়া বসিলাম। কেন জানি না আজ আমার বড় ভয় করিতেছে, মনে হইতেছে একটা কিছু ঘটিতে পারে। কঙ্কা সারা বিকাল নীরব হইয়া ছিল, কিন্তু কেন জানি না সেই নীরবতা আমাকে অত্যন্ত অস্বস্তি দিয়াছে।

মৃদু কণ্ঠের কথাবার্তা শোনা যায় না, তবু কান পাতিয়া রহিলাম। জানি আমার এ আচরণ অসঙ্গত, অভদ্র। কিন্তু আমি যে কঙ্কাকে বড় বেশি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

কঙ্কার উগ্র স্বরের বিক্ষোভ শোনা গেল, কিন্তু কথা বোঝা যায় না। বই রাখিয়া তাহাদের ঘরের পর্দার সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইলাম।

সবেগে যবনিকা আন্দোলিত করিয়া কঙ্কা বাহির হইয়া আসিল। উন্মত্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ঘৃণার স্বরে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে শুনছিলে সব? কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই তোমাদের? আচ্ছা, শোনো, ভালো করেই শোনো। আমি কঙ্কা নই, আমার নাম মঙ্গলা। নাম বদলে পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু কপাল বদলাতে পারলাম না। আমি জাতে কায়স্থ নই। আগাগোড়া মিথ্যা বলেছি। আমি নমঃশূদ্র—অর্থাৎ চণ্ডাল। আমার বাবা খুনী, এখনও আন্দামানে। যাও, যাও সকলকে বলে বেড়াওগে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? স্পাই!"

সে আমাকে স্পাই বলিয়াছে, তাহার বেদনা ছাপাইয়া কানে বাজিতে লাগিল "আমি চণ্ডাল, আমার বাবা খুনী।"

হতবুদ্ধির মত পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া একাকী সমাসীন জয়ন্তকে ব্যাকুল প্রশ্ন করিয়া কঙ্কার কথার অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

কঙ্কা মণ্ডল, অর্থাৎ মঙ্গলার বাবা ধনী। জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামটিতে অর্থের জন্য তাহার প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামে মিশনারি ইংরেজ মহিলারা শিক্ষালয় স্থাপন করায় মঙ্গলার বাবা তাহাকে ভর্তি করিয়া দিল। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার জোরে মঙ্গলা শীঘ্রই সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়। সে মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। মিশনারিরা আগ্রহে তাহাকে গড়িয়া তুলিবার কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু বাড়িতে নানা কারণে অশান্তি বাধিয়া মঙ্গলার শিশু-জীবনে ছায়াপাত করিল।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কুমারী কন্যা তারার প্ররোচনায় মঙ্গলার বাবা কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সুগঠিত দেহ, বলিষ্ঠ যুবক, চণ্ডাল হইলেও অর্থপ্রাচুর্যে রুচি ও কিঞ্চিৎ শিক্ষার সমন্বয় তাহার ঘটিয়াছিল। প্রবল যৌবন ও চণ্ডালসুলভ তপ্ত রক্তস্রোত তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। অশিক্ষিতা, নির্জীব পত্নী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা তারার চণ্ডাল-প্রণয়ী জুটিল।

পত্নীর সহিত কলহ-বিবাদ বাধিল তারাকে লইয়া। সে কালরাত্রি কঙ্কার এখনো মনে আছে। শয়ন কক্ষে মাতা তাহার পিতাকে ভর্ৎসনা করিতেছে—"ও হোলো গিয়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তুমি ওর গায়ে হাত দাও!"

সেই রজনীর ভয়াবহ দৃশ্য আজও কঙ্কাকে উন্মনা করিয়া রাখে। কলহ অবশেষে প্রহারে পরিণত হয়। ক্ষণিকের ক্রোধে আত্মবিস্মৃত মঙ্গলার পিতা পত্নীকে কন্যার আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিল।

পিসীমা ও পিশেমহাশয়ের হাতে মঙ্গলার নামে সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়া পত্নীহন্তা আজিও আন্দামানে! মিশনারি মহিলারা মঙ্গলার সমস্ত ভার নিলেন। মঙ্গলা আজ তাই কঙ্কা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

বুঝিলাম তাই কঙ্কার সমগ্র প্রকৃতিতে উগ্র স্বাতন্ত্র্য, বিষধর চক্ষু দুইটিতে তাহার পিতার উন্মত্ত যৌবন প্রতীক লাভ করিয়াছে।

জয়ন্ত বিপদে পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। সুকুমারী তরুণীর সহিত সে নির্বিবাদে প্রেম করিয়াছিল। সভ্যতার দীপ্ত আলোকের মধ্যেও যে কাহারো এমন রক্তকলুষিত অন্ধকার অতীত লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা সে ভাবিয়াও দেখে নাই।

বিষণ্ণ স্বরে জয়ন্ত আমাকে বলিল, "মিস্ মিত্র, দেখুন কি ব্যাপার। মায়ের কাছে ওর বিষয়ে সব বলেছিলাম। কায়স্থ শুনেই তিনি কেঁদেকেটে মাথার দিব্যি দিয়ে মানা করেছেন। এসব শুনলে তো আমাকে ওর সঙ্গে কথাই বলতে দেবেন না। বাবা মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি, ওঁর একমাত্র ভরসা আমি। আমিই বা কি করে মাকে এতবড় আঘাত দেব? আজ রাগের মাথায় কঙ্কা নিজের বিষয়ে সমস্ত বললো আমি ওর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করতেই। কি ভয়ানক সব কথা!"

আমি আর কি বলিব? নিজের মন লইয়া আমি ব্যস্ত। ঘোলা জলে আবার তরঙ্গ লাগিয়াছে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া জয়ন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—

"বিয়ের কথা আমার এখনো ঠিক হয় নি। ভেবে চিন্তে মত দেব বলেছি কয়েক দিনের মধ্যে। ওখানে বিয়ে করা ভিন্ন কোনো

উপায় নেই। কঙ্কাকে বিয়ে করলে আত্মীয় স্বজন কেউ আমার মুখ দেখবে না। নিজের নেই চালচুলো, ওকে নিয়ে কোথায় ভাসবো? আর মিস্ মিত্র আপনি তো সব জানেন। আমার পক্ষে কঙ্কা একটু বেশি উগ্র। ও যে আমাকে ভালবাসে সন্দেহ নেই, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার কেমন ওকে ভয় হয়। দেখি একটু বুঝিয়ে।" জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বাহির হইয়া গেল।

এ কয়েকদিন কঙ্কার মুখের দিকে চাহিতে সাহস পাই নাই। সামান্য যে তুটি একটি কথা বলিতাম তাহাও চোখ নামাইয়া। আজ প্রায় কুড়ি দিন পরে জয়ন্ত আসিলে কঙ্কা আমাকে ডাকিয়া লইল। "শান্তি, একটু আমার সঙ্গে নীচে এসো। ওর সঙ্গে একা থাকতে চাই না।"

অপ্রতিভভাবে বলিলাম, "আমি আর থেকে কি করবো? জয়ন্ত হয়তো তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চান।"

কঙ্কা উন্মাদের হাসি হাসিল—"পরামর্শ সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। বিয়ে স্থির করে বিদায় নিতে এসেছে।"

উকিলের ভঙ্গিতে বলিলাম, "ওই তোমার অন্যায় কঙ্কা। শোনো না কি বলেন।"

"কি বল্‌বে? চিঠি লিখেই তো কয়েক দিন আগে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে। এসো শান্তি। আমি ওর সঙ্গে একা থাকতে চাই না।" নির্মম ইস্পাতের ন্যায় কঙ্কার চক্ষু ঝলকিত হইল!

আমাকে কঙ্কার সহিত দেখিয়া জয়ন্ত একটু অস্বস্তি বোধ করিল। কিন্তু তাহার পরেই সে যেন নিষ্কৃতি পাইল। একটু ইতস্ততের ভাব দেখাইয়া বলিল, "মিস্ মিত্র তো সব জানেন, উনি কি এখানে—"

কঙ্কা উত্তর দিল—"শাস্তি এখানে থাক্।"

জয়ন্ত মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল "চিঠিতে তো সব জেনেছো কঙ্কা। বিয়ে করা ভিন্ন আমার উপায় নেই। মামারা সকলে জোর কর্‌ছেন, মা তো কথাই দিয়ে রেখেছেন। মামাদের অন্ন ধ্বংস করেছি সারাজীবন, তাঁদের কথার বিপক্ষে যাওয়া আমার অসম্ভব। মা সারাজীবন অসুখী, এখন তাঁর মনে এতবড় আঘাত দিতে পারব না আমি।"

কঙ্কা সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বিয়ের দিন হোলো কবে?"

জয়ন্ত অপ্রতিভ সুরে বলিল, "পরশুদিন। দেখো কঙ্কা, জন্ম থেকে পরের দ্বারে মানুষ। এ বিয়ে করলে আমার একটা স্থিতি হবে। নইলে তোমার জীবনটাও নষ্ট করে ফেল্‌বো। তোমার ভবিষ্যৎটাও তো দেখতে হবে।"

কঙ্কার নিরুত্তর মুখের প্রতি চাহিয়া কথা উল্টাইবার জন্য বেতালা প্রশ্নটাই করিয়া ফেলিলাম, "বউ কেমন হচ্ছে?"

জয়ন্ত কঙ্কার মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "মন্দ নয়। মুখখানা খুব সুন্দর।"

দেখিলাম, কঙ্কা পলকবিহীন নেত্রে জয়ন্তের মুখের দিকে চাহিয়া আছে—বর্ষাবিন্দু দুইটি কেউটিয়া তাহার দুই চক্ষে।

সে দৃষ্টিকে চাপা দিয়া সাধারণ স্বরে কঙ্কা বলিল—"একবার কিন্তু বৌ-ভাতের দিন গিয়ে তোমার বৌকে দেখে আস্‌বো জয়ন্ত।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। জয়ন্ত দ্বিধা ও সংশয়ে ইতস্তত করিতে লাগিল।

কোমল করুণ কণ্ঠে কঙ্কা আবার বলিল, "তুমি এতে না কোরো না জয়ন্ত। কিছু করব না, শুধু দূর থেকে একবার তাকে দেখে আস্‌বো।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুর নির্মম নিষ্ঠুরতাকে আবৃত করিতে অশ্রুধারা নামিল। আশ্চর্য!

জয়ন্ত বিগলিত, বিব্রতভাবে বলিল, "আহা, তুমি যেও, তাতে কি? তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা তো চিরদিন থাকবে। তোমার কষ্ট হবে ভেবে যেতে বলি নি। আমারও তো কষ্ট। আর একটা কথা কঙ্কা, তোমাকে যে চিঠিগুলো লিখেছিলাম, সেগুলো আর রেখে লাভ কি? আমাকে সেগুলো দিয়ে দাও।"

অশ্রুকলঙ্কিত মুখ তুলিয়া মর্মস্পর্শী স্বরে কঙ্কা বলিল, "হস্টেলের মেয়েরা দেখ্‌বে বলে সেগুলো আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি, একটাও রাখি নি। তখন কি জানতাম ওইগুলোই আমার শেষ পর্যন্ত থাকবে?"

এখনো কঙ্কার নিমন্ত্রণ-বাটিতে যাইবার কথা মনে পড়ে। সারাদিন সে বাহিরে ছিল, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া বড় কালো চামড়ার হাতব্যাগে কি সব রাখিয়া বেশভূষায় মন দিল। বুঝিলাম জয়ন্তর স্ত্রীকে দিবার জন্য উপহার। কঙ্কা সামলাইয়া লইয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আর অপার আত্ম-মর্যাদা তাহার। যেখানে কোনো প্রতিকার নাই সেখানে অহেতুক উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার বোকামী তাহার নাই।

সেদিনের কালো পোশাক কঙ্কা পরিধান করিল। সেই কাকপক্ষ কৃষ্ণ রেশমের শাড়ী ও কালো কাচের গয়না। আর সমস্ত কৃষ্ণতাকে পরাজিত করিয়া জ্বলিতেছে তাহার কৃষ্ণসর্পবৎ চক্ষু দুইটি সাপের মাথার মণির উজ্জ্বলতায়।

আমার দিকে ফিরিয়া শাণিত হাস্যে কঙ্কা প্রশ্ন করিল, "কেমন দেখাচ্ছে ?" বলিলাম, "নাগিণীর মত !"

নাগিণীর মতই সহসা কঙ্কা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল—"তাহ'লে চললাম শান্তি।"

জীবনে আর তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই।

বিবাহ-আসরে জয়ন্তের নব-পরিণীতার সুন্দর মুখমণ্ডলে নাইট্রিক অ্যাসিড্ নিক্ষেপ করিয়াই কঙ্কা ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার হস্তে জয়ন্তের লিখিত কঙ্কার নামের সমগ্র পত্রাবলী সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। সে পত্র সে নষ্ট করে নাই। লাল ফিতায় বাঁধা প্রেমপত্র। সপত্নিকে মীডিয়ার উপহার !

সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ জানে না। আজও তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

শুধু আমি স্বপ্নে দেখি ড্রাগন-বাহিত রথে মীডিয়াকে, শুভ্র হস্ত তাহার নিজ সন্তানের শোণিতে রঞ্জিত।

নারী আজও প্রেমের প্রতিশোধ লইতে জানে। মীডিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে।

ক্যামেলিয়া

"————ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।"—রবীন্দ্রনাথ

দুর্লভ এই ফুল। সাগরপারের স্বপ্নবিজড়িত শ্বেত রক্তিম পরাগ ইহার। যত্নে এ বিকশিত হয়, অনাদরে ইহার বিনাশ। চিক্কন পরাগ আর মদির সৌরভ। কত বিজন রজনীতে 'ক্যামেলিয়ার' সৌরভ-স্মৃতি বিমনা করিয়া তোলে, মনের মধ্যে নিদ্রিত অনুভূতি জাগিয়া উঠে। পুষ্পসৌরভে কাহাকে মনে পড়ে? সমস্ত জীবন দিয়া তাহাকে ফিরানো যায় না?

মোহন চক্রবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক ইতিহাসে। গ্রাম্য জমিদারের একমাত্র পুত্র, শাসনের লোক নাই কিন্তু সম্পত্তির সুবিধা পাওয়া যায়। পিতা মৃত মাতা স্নেহশালিনী, সুদক্ষ কর্মচারী-চালিত বিস্তীর্ণ সম্পত্তি। মফস্বলের কলেজ হইতে বি.এ. পাস করিয়া মোহন কলিকাতায় এম্.এ. পড়িতে আসিল।

মাতা বিবাহ দিতে চাহিলেন। পার্শ্বস্থ গ্রামের জমিদার কন্যা মনোনীতা লইলেন। কিন্তু ভাবী পত্নী ম্যাট্রিকুলেট নহে বলিয়া মোহন আপত্তি করিল। কলিকাতা আসিবার পূর্বে তাহার আদর্শের দৌড় ছিল ম্যাট্রিকুলেট।

মাতাও আসিয়াছেন নবক্রীত বাটীতে, এবং নবক্রীত গাড়ীতে বেড়াইয়া ফিরিতে লাগিলেন। মোহন নিজেকে আধুনিকতার

সহিত মিশাইতে না পারিয়া সরিয়া রহিল। সহপাঠিদের আকর্ষণ তাহাকে টানিতে পারিল না তাই তখনো তাহাকে বলা চলিত অ-সাধারণ।

চূড়ামণি যোগস্নান সারিয়া মাতা ফিরিলেন—"মোহন, যে মেয়েটির সঙ্গে তোর বিয়ের কথা চলছে আজ তাকে দেখে এলাম বাপু।"

মোহন চমকিয়া উঠিল। বন্দুক পরিষ্কার করিবার সরু ঝাড়ন নামাইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছয় ফুট উচ্চতা তাহার, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চাপা অভিমান ও কৌতুকপ্রিয়তার আভাস তাহার শিকারী ঈগলের ন্যায় সন্ধানি দৃষ্টিতে। "আমার বিয়ে? মানে?"

"আহা, পার্ক সার্কাসের মজুমদারদের মেয়ে রে। সেদিন তারা যে একজন ঘটক পাঠিয়েছিল। মেয়ে খুব শিক্ষিত, এবারে এম্. এ. দেবে!"

"বিয়ে আমি করবই না। আর এখন তো নয়। পড়তে পড়তে আবার বিয়ে করে কে?" মোহন উত্তর দিল।

"এখন না করিস এক বছর পরে তো করবি। এ মেয়েও তখনি পাস করে যাবে। কি চমৎকার মেয়েটি। ওর মা ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন। মেয়েটি গাড়ীতে বসেছিল। ওঠবার সময়ে মা দেখালেন।"

গাড়ীতে বসিয়া ছিল? ঠিক! উচ্চ শিক্ষিতা কিনা, গঙ্গাস্নান করিতে অপমান হয়; অথচ কালিঘাটে আসিবার অন্ধ পৌত্তলিকতাটা আছে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মোহন বলিল, "ওখানে বিয়ে করব না। তোমার লজ্জা করে না, বউ আনছ আমার সমান লেখাপড়ায়?

[illegible] আমাকে মানবে কেন? সে আমাকে দেখে হাসবে যেমন ইউনিভারসিটির ছেলেরা মনে মনে হাসে।”

“একবার মেয়েটিকে দেখ মোহন”—ব্যথিত স্বরে মাতা বলিলেন।

“না।”

তিমিরমেদুর আকাশের নিম্নে চলন্ত ট্রামগাড়ী। মোহনের গাড়ী আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কারখানায়। তাই সে কলেজ হইতে ট্রামে ফিরিতেছে। একটি মেয়েকে জায়গা দিয়া মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। কোনও কৃতজ্ঞতাসূচক কথা না বলিয়া মেয়েটি মোহনের দিকে চাহিয়া হাসিল। আশ্চর্য তাহার হাসি! সে আশ্চর্য!

মামাতো ভাই শিশির আসিয়া কার্ড দেখাইল “এইগুলো তুমি আর আমি মিলে বিলি করতে পারলেই হয় মোহনদা। বাবাঃ, কলকাতায় নেমন্তন্ন করার মত এতও বড়লোক আছেন! সাধারণ মেম্বার আমরা ক্লাবের, অথচ কোনও ক্রিয়াকর্মে আমাদেরই খাটুনী বেশি।”

নিমন্ত্রণ পত্রগুলি দেখিতে দেখিতে মোহন বলিয়া উঠিল, “ওরে বাবা! কী সর্বনাশ! এখানে আমি যাচ্ছি না।”

“কে মোহনদা?” শিশির কৌতূহলের সহিত চাহিয়া নামটি দেখিল।

“আরে, এই ডক্টর মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছিল। আমি একেবারে না করে দিয়েছি দেখে বাধ্য হয়ে মাও না করে দিলেন।” গর্বিতস্বরে মোহন বলিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে অথবা কলিকাতার সমাজে আধুনিক নাগরিক হিসাবে সে যতই কেননা তুচ্ছ হউক, পাত্র হিসাবে তাহাদের সমাজে তাহার মূল্য আছে!

"না করেছ কেন? বোকা তুমি,"—শিশির বিস্মিত হইল—"শুনেছি মেয়ে ভালো। শিক্ষাদীক্ষায় তিনি—।"

"রাখো তোমার শিক্ষা। ওই সব মেয়ে আমার চলবে না। ওরা অতি আধুনিকা।"

"যাক্‌গে তোমার কথা। একদিন বুঝবে। এখন চলতো সঙ্গে, না হয় গাড়ীতে বসে থেকো। গাড়ী আমি চালাই না, তোমার ড্রাইভারটিরও জ্বর। গাড়ী না হ'লেও অসম্ভব।" শিশির তাগিদ্‌ দিল।

শিশির ডক্টর মজুমদারকে কি বলিয়াছিল জানা যায় নাই। উদ্যান-সেবায় রত, সৌম্যমূর্তি পৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ীর নিকটে আসিয়া বিমুখী মোহনকে সাদরে আহ্বান করিলেন—"এসো, তুমি নেমে এসো। তোমার বাবা যে আমার বিশেষ বন্ধুলোক ছিলেন, অবশ্য সে পরিচয় আমি তোমাদের কাছে দিই নি। তবু মেয়ের বিয়ের জন্য আগে তোমাকেই খোঁজ করেছিলাম। আমার বাড়ীর দরজা থেকে তুমি ফিরে যাবে, সে কি হয়?"

মোহনের বিতৃষ্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আহা, লজ্জা বা দ্বিধার কি আছে তোমার? সে সব কথা তো মিটেই গেছে। তোমার মায়ের মুখে এখন তুমি বিয়ে করবে না শুনে আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখছি। ওতে তোমার কিছু লজ্জা পাবার নেই। এসো এসো, আমার স্ত্রী তোমাকে দেখলে কত খুশী হবেন।" শিশিরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মোহন নীরবে ডক্টর মজুমদারের অনুগমন করিয়া একতলায় রাস্তার উপর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

জানলার পাশে সেটীতে একটি মেয়ে বসিয়া আছে, বামহস্তে তাহার বিদেশী কাব্যসঞ্চয়। শুভ্র গ্রীবার পশ্চাতে কালো চুলের পাশে উচ্চ টিপাইতে রক্ষিত শুভ্র ক্যামেলিয়াগুচ্ছ। ক্ষীণ সৌরভে বাতাস চঞ্চল।

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। আড়ম্বর করিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া মিষ্টান্ন ও সরবতের পাত্র সম্মুখে করিয়া ইহাকে দেখিতে আসিতে হয় না, জীবনে এ একবারই দেখা দেয়। সে পরমক্ষণ।

ডক্টর মজুমদার পরিচয় করাইয়া দিলেন "এই আমার মেয়ে অমিতা। আর অমি ইনি আমার এক বন্ধুর ছেলে।"

মেয়েটি নমস্কার করিল না, মোহনের দিকে চাহিয়া একবার হাসিল। সেই পরিচিত হাসি! সে আশ্চর্য!

টুক্‌রা টুক্‌রা কথা খণ্ডমণির মত অন্তরে জ্বলিতে থাকে। বঙ্কিম অধরৌষ্ঠে অলস হাসিটি মনে পড়ে। দিনযামিনী প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া যায়।

মোহন খেলাধূলা, বন্দুক, কুকুর সমস্ত ত্যাগ করিয়া কাব্যচর্চায় মন দিল। রবীন্দ্রকাব্যে তাঁহার শয়নকক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আভাসে মাতার নিকট মনের কথা জানাইতে তিনি উত্তর দিলেন, "একবার না করে দিয়ে আবার আমি যেচে বিয়ে দিতে বল্‌তে পার্‌ব না। তুমি তো যাতায়াত করছো, তাঁদের পছন্দ হ'লে তাঁরা নিজেরাই কথা পাড়বেন। এর মধ্যে আমি আর নেই বাপু।"

মাতার নিকটে কোনও সুবিধা হইল না। অমিতার মাতা-পিতার নিকটেও কোন সুবিধা হইবে না। তাঁহারা এককথার মানুষ, অত্যন্ত ভাল লোক। মুখের 'না'কে-ই অন্তরের না বলিয়া

ধরিয়া লইয়া এ বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন উপায় একমাত্র অমিতা নিজে। তাহার মনের কথা বোঝা যায় না। চারিপাশে যেন সে তুর্লঙ্ঘ্য মায়াজাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে। নির্লিপ্ত ঔদাস্যে সে যেন সুদূর। পূর্বের প্রত্যাখ্যান সে জানে কিনা ধরা যায় না। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের হয়তো মার্জনা আছে।

ছোট ছোট কথা মণির আভার ন্যায় জ্বলে।—"আচ্ছা, আপনি কখনো গঙ্গাস্নান করেন না ?"

অমিতা হাসিল, "না, বড় লজ্জা করে। লজ্জা গঙ্গাস্নানকে নয়, লোককে।"

"আপনি কি কখনো বিয়ে করবেন না ?" নির্লজ্জের মত মোহন প্রশ্ন করিয়াছিল।

"কর্‌ব সেইদিন যেদিন শেষ কথা মেয়েদের হাতে চলে যাবে।"

হায় অভিমানিনী—শেষ কথা তো বহুদিনই তোমাদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, তোমরা তাহা জান না। এইখানেই ভুল।

মোহন আধুনিক হইবার উগ্র প্রয়াসে রত হইল। যাহাদের সঙ্গ সে ঘৃণায় প্রত্যাখান করিত, আজ তাহারাই তাহার নিত্য-সঙ্গী। নারীচিত্তজয়ে তাহারা নাকি অব্যর্থ অস্ত্রের সন্ধান রাখে।

অজস্র চুরোটিকা মোহনের অধরকে ম্লান করিল। ধুতির সহিত সার্ট ও শীতকালে গলাখোলা কোট সে ত্যাগ করিল। ফিতা-বাঁধা জুতোর বোঝা সে বেহারাকে বিতরণ করিয়া লপেটা ও গ্রীসিয়ান্ স্লিপার কিনিল। ইংরেজ দর্জির ইংরেজি পোশাকে ও অকারণে

হোটেল-ভ্রমণে সে অভ্যস্ত হইল। বিভিন্ন মিক্‌সড্ ক্লাবে সে সভ্য হইল এবং মেয়েদের সহিত অবাধ মেলামেশায় তাহার রুচি দেখা গেল। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিল অমিতার অপরূপ ছবি। সেই লক্ষ্যে যাইবার জন্য, সেই উদাসী হৃদয় জয় করিবার জন্য এ প্রবল সাধনা।

কলিকাতা সমাজ মোহনকে সাদরে গ্রহণ করিল। তাহার অর্থ আছে, সে স্বাধীন। তাহাকে দিয়া অনেক কাজ পাওয়া যায়। সে সরল, তাহার সন্দেহ ও দ্বিধা জাগে না। অসঙ্গত আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখিয়া সে মনে করে ইহাই আধুনিক জগতের ধারা, এই ধারাই তাহাকে আশ্রয় করিতে হইবে রমণীর মন পাইতে।

পরিচয় বন্ধুত্বে পর্যবসিত হইল।

স্তিমিত গোধূলির আলো সামনের বাগানে সোনার আভা বিতরণ করিতেছে। আজও ক্যামেলিয়া গুচ্ছে অমিতার ঘর সজ্জিত। আজও বাতাস ক্যামেলিয়া সৌরভ-মন্দির।

"তোমার বুঝি ক্যামেলিয়া ফুল খুব ভাল লাগে, অমি ?" মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগে।"

"তা-তো লাগবেই। বিদেশী ফুল কিনা। ইংরেজীর ছাত্রী তো।" মোহন পরিহাস করিল।

"কেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্যামেলিয়া' পড়ো নি ? এ ফুলকে আমার কাছে তিনিই অমর করে দিয়েছেন, কোনও বিদেশী কাব্য নয়।" অমিতা উত্তর দিল।

মোহন 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি 'পুনশ্চ' পুস্তকে পড়িয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখে নাই। এখন ভাবিয়া বলিল, 'কমলা মেয়েটিকে কবি ক্যামেলিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ক্যামেলিয়া ফোটানো কঠিন, মেয়েটির মন পাওয়া দায়। শেষ পর্যন্ত ফুলটা উঠ্‌লো অন্যের চুলে, মেয়েটির মন রইলো অন্যের কাছে।"

বাহিরে পুষ্পিত ক্যামেলিয়া গাছের দিকে চাহিয়া উন্মনা সুরে অমিতা বলিল—"মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের একটু ভুল হয়েছে। অত ভালবাসা আর সাধনা কি মেয়েদের মনে শুধু বিতৃষ্ণাই জাগায়?"

মোহন হাসিল। "ক্যামেলিয়া যেমন নানা শ্রেণীর আছে তেমনি মেয়েদেরও নানা শ্রেণী। রবীন্দ্রনাথের ভুল হয় না। কমলার মত মেয়েকে আমি জানি। সে তুমি।"

অমিতা চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার চিরদিনের আশ্চর্য সুন্দর হাসি হাসিল—"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, তুমি তাই। কিছুতেই তোমার মন আমি পেলাম না।"

সেই হাসির সহিত অতি কোমল কণ্ঠে অমিতা বলিল—"পাও নি নাকি?"

চিরকাল ধরিয়া ভালবাসা পাইবার আনন্দ কি এতই অপরিসীম? বর্ষণ ব্যাকুল রাত্রিতে নিদ্রা আসে না, সুখ বেদনার মত তীব্রতায় দেহকে পীড়া দেয়। আধো জাগ্রত নয়নে সহস্র ক্যামেলিয়ার পট-ভূমিতে ফুটিয়া ওঠে একটি মুখ।

আরও একটু বিলম্ব আছে। তাহাকে আরও একটু উপযুক্ত হইতে হইবে। অমিতা কলিকাতায় মানুষ, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের দুহিতা। উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা তাহার। মোহন দেখিয়াছে বর্তমানের

উপর তাহার অনুরাগ, চিরচলিত-প্রথার সে বিদ্রোহিণী। সুতরাং সে আধুনিকা, যে সমাজ আজ মোহনকে ডাকিয়া লইয়াছে অমিতা অবশ্য সেই সমাজের অনুগামিনী! তাহারই বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু-বৃন্দ-পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোহন যোগদান করিয়াছে। সে-সব স্থানে অমিতার দেখা পাওয়া সুলভ না হইলেও অসম্ভব নয়। আরও একটু এই সমাজে বেশি মিশিতে হইবে, আরও একটু পালিশ দরকার। আর মাস তিনেক—তাহার পর বিবাহ প্রস্তাব।

একদিন যাহার শিক্ষারুচি তাহার নিজের পক্ষে অনুপযোগী হইবে সন্দেহে মোহন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আজ তাহারই প্রত্যাখানের পথ রুদ্ধ করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। আজ তাহারই রুচিতে নিজেকে গঠিত করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা।

একদিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের চ্যারিটি পার্‌ফরমান্স। পিছনের আসন হইতে অমিতা চাহিয়া দেখিল দরজার পাশে একটি অতিসজ্জিতা ও অতিরঞ্জিতা মেয়ের সহিত মোহন আলাপ করিতেছে অন্তরঙ্গভাবে। তাহাদের উচ্চকণ্ঠ ও অযথা হাস্যে সঙ্গীতাদি ব্যাহত। মেয়েটির নখর-রমণীয় হস্ত মোহনের শুভ্র গরদের পাঞ্জাবীর আস্তিনে স্থাপিত।

বন্ধুর বাড়িতে শারদ-উৎসব।

জলযোগের পর সম্মুখের সারিতে উপবিষ্ট খিচুড়ি-সমাজের যুবকবৃন্দের অনুসরণে মোহন সিগারেট ধরাইল। সামনে তাহার [illegible]-মহিলাকুল। অমিতার স্থির দৃষ্টিতে ঘৃণার ছায়া পড়িল।

মার্কেট হইতে ফিরিবার পথে অমিতা ট্রামের অপেক্ষায় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবার জন্য গাড়িখানা পাইবার উপায় নাই। ডাক্তার মানুষ, রোগীদের আহ্বান সর্বদা। তাই মাঝে মাঝে অমিতাকে ট্রামে ফিরিতে হয়। এমনি একদিন ট্রামে মোহনের সহিত প্রথম দেখা।

মোহনেরই উজ্জ্বল-নীলাভ গাড়িতে মোহন চলিয়া গেল ইংরেজী সান্ধ্যপোশাকে। পাশে তাহার মিক্‌সট্‌ ক্লাবের সভ্যা মিস্‌ আগর-ওয়ালা। রঞ্জিত বোসের বাড়ি নৈশ ভোজনে যাইবার সময়ে তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাইতে মিস্‌ আগরওয়ালা হস্টেল্‌ হইতে মোহনকে টেলিফোনে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার একখানি হস্ত মোহনের কাঁধের পিছনে গদীর উপর আস্তৃত, অন্য হাতে মোহনের মুখের চুরুটে তিনি অগ্নিসংযোগ করিতেছেন। মোহন অমিতাকে দেখিতে পাইল না।

রাত্রির নিবিড়তায় সম্মুখের পথ অন্ধকার। কালো পীচের রাস্তা সমস্ত নগরীকে যেন লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে। চোখে ঘুম নাই, তাই বারোটার পরেও অমিতা গাড়ি-বারান্দার অন্ধকারে রেলিংয়ের আড়ালে একা বসিয়াছিল। বহুদূর হইতে গুঞ্জনধ্বনি অবশেষে বাড়ির সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পথের উল্টা দিকে একখানা বড় খোলা গাড়ি থামিয়া গেল। গাড়ি অপ্রকৃতিস্থ যুবকমণ্ডলীতে পূর্ণ। এ রাস্তা দিয়া এ রকম গাড়ী এত রাত্রে অনেক গিয়াছে। আরোহী-দের বর্তমান অবস্থা অনুমান করতে অমিতার ভুল হইল না।

ঈষৎ মত্তস্বরে একজন গান গাহিতেছিল—

"Rio Rita here is my heart!"—

"আহা এখানে থামলে কেন অজিত হঠাৎ ? রাত্তির তো অনেক হয়েছে, বাড়ি গেলে আর ঢুক্‌তে দেবে না যে।"

"আরে থাম্‌ব না ? এটা যে মোহনের ভাবী শ্বশুরবাড়ী। পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আজ প্রথম Bar এর মুখ দেখ্‌লো। Serenade-টাও সেরে যাক্।"

"মডার্ন হোতে গেলে তিনটিই চাই—War, Wine, Woman. এখানে পেছোলে কি চলে ? পড়েছ আমাদের হাতে।"

সমস্ত অসংলগ্ন কথা ও উচ্চহাস্যের কলরব ভেদ করিয়া মোহনের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, "না, না, এ রাস্তায় এলে কেন ? এখানে নয়, এখানে নয়। এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"

অমিতার আহত-স্তব্ধ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে গাড়িখানা গেল।

•

মুখোমুখী কথার সাহস মোহনেব হইল না। সে টেলিফোন্ করিয়াছিল।

"সে কি অমি, তুমি কি বল্‌ছ ? তার মানে ?"

অপরদিক হইতে উত্তাপবিহীন স্বরে উত্তর হইল, "তার মানে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।"

"আমাকে কি তুমি ভালোবাসো নি ?" মোহনের স্বরে নিরুদ্ধ অভিমান ও মূক পশুর অজ্ঞান বিস্ময়।

"বেসেছিলাম। দেখেছিলাম আমার চারপাশের সহস্র পুরুষের মত তুমি নও। তুমি এদের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু তারপরে তুমি এদের মতই হতে চাইলে।"

"আমি, আমি তোমার মনের মত হতে চেয়েছিলাম শুধু। এরা তো তোমারি সমাজ।"

"আমার সমাজই তুমি দেখেছিলে, তা'র কতটা আমার ভাল লাগে আর কতটা লাগে না সেটা ভাববার অবকাশ তোমার হয় নি। তুমি অন্তরের শিক্ষা আর বাইরের চাকচিক্যের প্রভেদ জান না।"

"তুমি কি আধুনিক নও ?" মূঢ় মোহন প্রশ্ন করিল।

"আমি আধুনিক, কিন্তু অসভ্য নই।"

"আগাগোড়া আমার ভুল হয়েছে। এই প্রথম ভুল, এই শেষ হবে। তুমি বিশ্বাস করো।"

"আর হয় না। তুমি নিজেকে বড় বেশি নষ্ট করে ফেলেছ।" ওপারের স্বর নির্লিপ্ত, সুদূর।

"আমাকে ক্ষমা করো।" রিসীভারের বক্ষে অজস্র বেদনা ঝরিয়া পড়িল।"

"ক্ষমা করতে পার্‌ব না। তুমি ঠিক বলেছিলে। রবীন্দ্রনাথের ভুল হয় না, আমি সত্যই 'ক্যামেলিয়া'।"

ওপার হইতে রিসীভার নামাইয়া রাখিবার ক্ষীণ শব্দ পাওয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে—টেলিফোন করিবার ছোট ঘরটিতে আরো বেশী। সম্মুখে রাত্রি সমাগত—নিরাশার অন্ধ যবনিকা। উপায়হীন নয়নের সম্মুখে সহস্র ক্যামেলিয়ার পটভূমিতে জাগিয়া আছে একটি মুখ।

নার্সিসাস্

তাহাকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। ভালবাসা কাহাকে বলে জানি না, কাজেই এ ভাললাগা ভালবাসা কিনা বলিতে পারিলাম না।

আমার জীবন-পথে বহু পুরুষ আসিয়াছে। তাহারা সকলেই আমাকে ভালবাসিয়াছিল, আমি কাহাকেও বাসি নাই। এই আমার পরিচয়।

তবু, নিদ্রাবিহীন রাত্রে আকুল বাতাসের ক্রন্দনে তাহাকে মনে পড়ে। বর্ষামুখর অপরাহ্নে তাহার কথা আমাকে বিমনা করে। উজ্জ্বল বসন্ত দিনে অকারণে তাহার হাসি কানে ভাসিয়া আসে। সহস্র যোজন দূর পথ হইতে সে আমাকে ডাকে—"নার্সিসাস!"

এ ডাক ভালবাসার নহে, ঘৃণার। নারীর প্রতি পুরুষের যত ঘৃণা থাকিতে পারে, শেষদিনে সে আমাকে তাহাই দিয়াছে। তারপর—আমাদের মধ্যে আসিয়াছে ব্যবধান। সে ব্যবধান সাগর সমান। হয়তো কখনো সে ফিরিবে না, কারণ সে আমাকে ঘৃণা করে। আর আমিও ডাকিব না, আমি তাহাকে তো ভালবাসি না! কিন্তু সে এতদূরে যাইয়া আমাকে এত উন্মনা করে কেন?

সহশিক্ষার কলেজে সে ছিল আমার সহপাঠি। দীর্ঘ দেহ তাহার উন্মুক্ত তরবারীর মত। বিশাল নেত্রে তাহার সহাস্য কোমলতা। আর সে ললাট প্রতিভার লীলাভূমি! রবীন্দ্রনাথের "সন্ন্যাসী উপগুপ্তের" সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

"সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

প্রশান্ত গুহ ছিল নারীচিত্তদহনকারী অগ্নি। তাহার নির্লিপ্ত সৌন্দর্য দূর হইতে আকর্ষণ করিত, তাহার প্রতিভা মুগ্ধ করিত। সে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, সে ছিল কবি এবং শিল্পী।

আমি কলেজে যাইতে ভালবাসিতাম না। পড়াশোনা কখনও আমার ভাল লাগে নাই। মেয়েদের সাহচর্যও তেমন লোভনীয় নয়। বেশি পড়াশোনা করিলে অনেক বাঙালী মেয়ের যেমন অনুর্বর মরু-ভূমির মত মূর্তি হয়, আমার অধিকাংশ সহপাঠিনীর ছিল তাহাই। ছেলেদের দিকে তাকাইবার আমার অবসর ছিল না বাড়িতে স্তাবকদলের প্রাচুর্যে। এই কারণে সহপাঠিগণ আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া বিরক্তিভাজন হইয়াছিল।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর কলেজে যাইয়া দেখি সহপাঠিনীরা তুমুল আন্দোলন করিতেছে। তাহারা প্রশান্ত গুহের কাছে ইংরেজীর নোট চাহিয়াছিল। প্রশান্ত ধীরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে বই পড়াই যথেষ্ট। মণিকার আক্রোশ দেখিলাম বেশি। তাহার ভ্রাতা-পরিচালিত একখানা মাসিকপত্রে লেখা দিবার অনুরোধে সে প্রশান্তকে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা চিঠি দিয়াছিল; প্রশান্ত উত্তর দেয় নাই।

শুনিতে শুনিতে আমার অধরে কৌতুকহাস্য দেখা দিল। একজন সামান্য পুরুষ! তাহার জন্য এতগুলি নারীর ব্যাকুলতা! যাহারা রমণীর পদপ্রান্তে ভিখারী হইয়া প্রেম ভিক্ষা করে তাহাদের একজনের এত স্পর্ধা?

সহসা মণিকা আমাকে অনুরোধ করিল, "আচ্ছা ইরা, ছেলেরা তোর জন্য পাগল। তুইতো ফিরেও দেখিস না। দে না প্রশান্ত গুহকে একটা শিক্ষা। তাহলে বুঝতাম তোর ক্ষমতা।"

অলসভাবে মণিকার জামার কাজটা পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলাম, "কি শিক্ষা দিতে হবে ?"

উত্তেজিত স্বরে মণিকা বলিল "ওকে নাচাবি। ও তোর জন্য যখন পাগল হবে তখন দূর করে তাড়িয়ে দিবি।" সকলে সমস্বরে সায় দিল।

চাহিয়া দেখি সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিপাশে অনুরোধের ব্যাকুল স্বর। মনে হইল দেখা যাক্, সময় কাটানোর সঙ্গে এতগুলি নারীকে প্রতিশোধের সুযোগ দেওয়া মন্দ কি ? নিশ্চেষ্ট মনে ক্রুর প্রবৃত্তি এবং উদ্যম দেখা দিল। মনের আবেগ দমন করিয়া বাহিরে উদাস কণ্ঠে বলিলাম, "দেখি, কি হয়।"

তারপর চলিল আমার হৃদয় জয়ের নিষ্ঠুর অভিযান। রূপ চিরদিনই প্রচুর, তাহাকে সজ্জিত করিবার নব প্রচেষ্টায় আরো লোভনীয় করিয়া তুলিলাম। পড়াশোনার আগ্রহে প্রতিদিন নিয়মিত ক্লাস করিতে আরম্ভ করিলাম। মীটিং, সাহিত্য-সভা সমস্ত কিছুতেই আমাকে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না, আমার পূর্বেকার নির্লিপ্ত ঔদাস্য প্রশান্তেরও ঔদাস্যকে জয় করিয়াছিল। তাহার স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টি আমার দেহ বন্দনা করিয়া ফিরিতে লাগিল। তারপর উভয় পক্ষের আগ্রহে আলাপ পরিচয় গাঢ়তর হইতে লাগিল।

প্রশান্তকে আমি অধীর উন্মাদ কামনায় নিকটে টানিলাম। কটাক্ষে, হাস্যে, ভঙ্গিমায় যাহা বাকী ছিল, আমার ভালবাসাহীন বন্ধুত্বে তাহা সম্পূর্ণ হইল। নারীচিত্তবিজয়ী প্রশান্ত গুহ আমাকে ভালবাসিল। সে কি ভালাবাসা! যৌবনের আকুল পিপাসা, বন্ধুত্বের স্নেহপ্রীতি, ভক্তের পূজাবন্দনায় প্রশান্ত আমাকে কাছে

পাইতে চায়! একবার মনে হইল তাহাকে মুক্তি দিই। ভাল যাহাকে বাসি নাই, তাহাকে দগ্ধ করিব না; কিন্তু সহপাঠিনীদের কথা মনে পড়ে, মনে হয় নারীর অবমাননায় পুরুষের উপর প্রতিশোধ লইবার ভার আমার। তাহার উপর চিরদিনের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি আমার, হাতের কাছে সুন্দর ক্রীড়নকটি ত্যাগ করিতে চাহিল না। আমার তাহাকে ভাল লাগে, তাহার প্রেম ভাল লাগে,—তাহাকে আরো চাই।

মেয়ের দল আমাকে স্তুতিগানে চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রশান্ত আমাকে চায়, এইবার আমার প্রত্যাখান হইলেই নরমেধ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু প্রশান্তকে আমার মত লঘুচিত্তারও ভাল লাগিল, কমনীয় তাহার মূর্তি, মধুর তাহার ব্যবহার। জলন্ত বহ্নির মত তাহার প্রেম, উদ্দীপ্ত তাহার প্রতিভা। অন্য অসংখ্য পুরুষের মত হতভাগ্য সে আমাকে ভালবাসিয়া ভুল করিয়াছিল। আমি পুরুষের দেহের মূল্য বুঝি, অন্তর আমার কাছে অজানা। নারীকে পুরুষ ভালবাসে তাহার যৌবনের জন্য, তাহার রূপের জন্য। যতদিন নারীর সে সম্পত্তি আছে, ততদিন পুরুষ তাহাকে কেবল ভালই বাসিয়া যাইবে আমার বিশ্বাস ছিল। তাই নিজের মনের দিকেও চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার ছায়া মদির তন্দ্রার মত নামিয়া আসিয়াছে। খোলা জানালার সামনে ইলেকৃট্রিকের পিলসুজে সাদা কলাই-করা পরীমূর্তি হস্তে আলো লইয়া দণ্ডায়মান। আমার হাতে একখানা বই ছিল।

নিঃশব্দে কে যেন টেব্‌ল্‌ল্যাম্পটির আলো নিভাইয়া দিল, সারা ঘরে অন্ধকারের বন্যা। ক্যালিফোনিয়া পপির মিষ্ট গন্ধে বুঝিলাম প্রশান্ত আসিয়াছে। আলো জ্বালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতক্ষণ এসেছ?"

সাম্‌নের চেয়ারে বসিয়া প্রশান্ত বলিল, "অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পাঠরতা মূর্তি দেখ্‌ছিলাম। এত মন দিয়ে কি পড়া হচ্ছে?"

"ওঃ, তোমাদের Eliotএর কাব্য সঞ্চয় ও 'Waste Land,' কি এত যে ভাল দেখ তুমি? আমার তো এর কবিতা বিশ্রী লাগে।"

প্রশান্তর পদ্মপলাশ নেত্রে আগ্রহ ও কৌতুক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার প্রিয় কবিকে অবজ্ঞা করিবার জন্য সে আমারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল, "ভালো লাগে না, কেন?"

জানি প্রশান্তর সহিত তর্কে জয়ী হইবার ক্ষমতা আমার নাই; অসীম তাহার জ্ঞান; তীক্ষ্ণ তাহার বুদ্ধি। তাই এলোমেলো উত্তর দিয়া অবহেলা দেখাইলাম, "যত সব ন্যাকামির ছড়া। প্রেমের কবিতা পড়তে আমার ঘেন্না হয়। প্রেম বলেই কিছু নেই, তার আবার কবিতা!" অট্টহাস্যে টেবিলের উপর মোহন-ভঙ্গিতে এলাইয়া পড়িলাম।

"এই ধরো তোমার সেই প্রিয় কবিতাটি—" আবার বলিতে আরম্ভ করিলাম "Portrait of a Lady, অমন কি আর সত্যি হয়? অতদিন ধরে একজনকে মনে থাকে কখনও? তার ওপর মেয়েটি কোনও প্রতিদান দেয় নি।"

প্রশান্তর দৃষ্টি ম্লান হইয়া গিয়াছিল, "কেন অমন হবে না? ও রকম মেয়েও আছে, অত ভালবাসাও দুর্লভ নয়। অতদিন?

সারা জীবন মনে থাকে। তুমি ভালবাসাকে বাজে সেন্টিমেন্টালিটি বলে ভাবো, তোমার তো এ মনে হ'বেই।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কিন্তু ছেলেটি আচ্ছা জব্দ হোল। যখন সে মনে মনে আকাশ-কুসুম তৈরী করছে মেয়েটি স্বাভাবিক বন্ধুভাবে দেখ্ছে। ইস্, কি মজার! "I shall go on serving tea to friends"—মুখের ওপর মেয়েটি বলে যাচ্ছে—।"

প্রশান্তর মুখে ব্যথার ছায়া, আমার দিকে চাহিয়া অনেকটা নিজের মনে, অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, "এত সুন্দর অথচ এত নিষ্ঠুর!"

পরিণামরমণীয় বর্ষার বিকালে মণিকার বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে গেলাম। অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরাও আসিয়াছিল। আমার রক্ত-কোকনদ, হাল্কা বেনারসী শাড়ীখানির কারুকার্যখচিত পাড় প্রশংসা করিতে করিতে সিপ্রা বলিল, "যত দিন যাচ্ছে ততই ইরা যেন আরো সুন্দর হচ্ছে।"

নিজের রূপ বর্ণনা আমার চিরকাল ভাল লাগে। নিপুণ প্রসাধন ও অপরিসীম যত্নে এ রূপকে আরও উজ্জ্বল করিবার প্রয়াসে কোনদিন বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। সৌন্দর্যের বন্দনা শুনিবার জন্য উৎসুক কান পাতিয়া রহিলাম।

বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কেক্ কাটিতে কাটিতে মণিকা মন্তব্য প্রকাশ করিল "রূপ থাক্লে আর কি বলো? সাধারণ একটা ছেলেকেও জব্দ কর্তে পাচ্ছে না, এটা কি কম দুঃখের কথা?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিপ্রা বলিল, "তার মানে?"

"মানে আর কি? শ্রীমতী প্রশান্তকে খেলাতে গিয়ে নিজেই

ধরা পড়ে গেছেন। প্রশান্ত তো বন্ধুদের কাছে এ নিয়ে গল্প করে, বিদ্রূপ করে বেড়াচ্ছে।”

ভুলিয়া গেলাম প্রশান্তর কোনও বন্ধু নাই, নির্লিপ্ত ঔদাস্যে সে চিরদিন সুদূর। ভুলিয়া গেলাম হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া আন্দোলন সে কখনও করে না। দিশাহারা ক্রোধে বলিলাম, “বল্‌তে চাও তার মত ছেলেকে আমি গ্রাহ্য করি?”

“আমি বল্‌ব কেন, সবাই বল্‌ছে। তা নইলে, আমাদের যে কথা ছিল সে সব ভুলে তুমি প্রশান্তকে নিয়ে মেতেই রয়েছ।” তিক্ত হাসি গোপন করিতে মণিকা অধরের কাছে চায়ের চিত্রিত পেয়ালা তুলিয়া ধরিল।

অপমানে, রোষে আমার সর্বদেহ জ্বলিয়া উঠিল। নমিতার উদ্যত স্যাণ্ডউইচ্‌ প্রত্যাখ্যান করিয়া উঠিতে উঠিতে কোনমতে আহতা সর্পীর গর্জনে বলিলাম, “আচ্ছা।”

চায়ের আসর হইতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম কাউচের উপর অন্ধকারে সে শুইয়া আছে। ব্যগ্র বাহুপ্রসারণ এড়াইয়া বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, “কে?” বিনীত কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল, “আমি।”

মনে মনে হাসিলাম। প্রশান্ত গুহ, আজ এখনই তোমার দুরদৃষ্ট তোমাকে ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর গহ্বরে টানিয়া আনিয়াছে। আমাকে লোকের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিবার, বন্ধুদের কাছে গল্পের খোরাক করিবার জন্য শিক্ষা আজই তোমাকে দেব। খেলার শেষ এখনি হইবে। কিন্তু, রাগ নয়, তর্জন নয়; অবহেলা ও বিদ্রূপে তোমার হৃদয় ভাঙিতে হইবে।

রূঢ়স্বরে বলিলাম, "আমিটা কে ?"

"গলা শুনেও চিন্‌তে পারছ না ?"

পরম তাচ্ছিল্যে উত্তর দিলাম, "চিনে রাখার দরকার মনে করি নি।"

আগের মতই উত্তাপবিহীন স্বরে উত্তর হইল, "আচ্ছা। আমি প্রশান্ত।"

আলো জ্বালাইলাম। লাল আলো সে ভালবাসে বলিয়া নিজের হাতে আমার বসিবার ঘরের আলো লাল আবরণী দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল। প্রলয়ের সূচনায় রক্তমেঘের মত সেই লাল আলো হাসিয়া উঠিল।

"ওঃ, প্রশান্ত। তুমি না হ'লে কা'র এমন অজস্র সময় শুয়ে-বসে নষ্ট করার আছে।" আয়নায় কেশবেশ ঠিক করিয়া সোফায় অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বসিলাম।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত বলিল, "একটা বিশেষ দরকারী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

"বলে ফেলো তাহ'লে। কিন্তু দোহাই তোমার, বাজে কবিত্ব করে সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাজ না থাকতে পারে, আমার আছে।"

প্রশান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার কাজ নষ্ট হবে না। ভাব্‌ছি যুদ্ধে নাম লেখাব। তুমি কি বল ?" একান্ত আগ্রহে ও প্রত্যাশায় সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমার মন বুঝিবার জন্য এ প্রস্তাব বুঝিলাম। ইহার মধ্যে কতবড় আশা, আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু, আজ তাহাকে আঘাত দিতে দ্বিধা হইল না। অতিশয় অনাগ্রহ,

উদাসীন ভাবে বলিলাম, "সে আমি কি বল্‌ব? তোমার আত্মীয়স্বজন সবাইকে বলে মত নাও। আর, হায় হায়, শেষে তুমিও কর্‌বে যুদ্ধ! মেয়েদের স্তবগাথায় কলম-ধরা হাতে তলোয়ার কি মানায়? বন্দুকের শব্দ শুনে শেষে মূর্চ্ছা না যাও! কবি-কবি ভাব নিয়ে প্রেম-করা চলে! যুদ্ধে যেতে দরকার হয় পৌরুষের।"

প্রশান্ত উঠিয়া বসিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। "আমাকে তুমি শেষে এই মনে কর?"

"শেষে আগে কি প্রশান্ত? চিরকাল তুমি যা, তাই তোমাকে মনে করি। ন্যাকা, মেয়েলি ঢং-এর কবি বা পণ্ডিত আমার দুচক্ষের বিষ। আমি চাই বজ্রের মত শক্ত পুরুষ।" একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলাম, "যুদ্ধে যাবে, এই কথা? আমি ভাবলাম অন্য কিছু!" তাহার নত মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া ছুরির মত শাণিত হাস্যে বলিলাম, "ভাবলাম—বুঝি বা বিবাহ প্রস্তাব!"

তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে সে বলিল, "ধরো, তাই যদি হোত?"

কোনও দিন প্রশান্ত এভাবে কথা বলে নাই। অপ্রতিভ-ভাব মুহূর্তে দমন করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, "তুমি! তোমাকে আমি বিয়ে করব? আশ্চর্য, কোনও দিন কি বোঝো নি তোমার ওপর আমার সামান্য করুণা ভিন্ন কিছুই নেই? কি বোকা তুমি?"

প্রশান্ত উঠিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল, "ইরা, তোমাকে ভালবাসার বোকামি ভিন্ন জীবনে কখনো ভুল করি নি। বোকা আমি নই, একথা তুমিও জানো। আমি তোমাকে বড় বিশ্বাস

করেছিলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে খেলাবার কি দরকার ছিল? প্রেমের অভিনয় কেন করেছ তুমি?"

তাহার রক্তলেশশূন্য সাদা মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন মায়া হইতে লাগিল। ভাবিলাম, না, আর কেন? কিন্তু তাহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা আমাকে নিষ্করুণ করিল। উত্তর দিলাম "শোনো প্রশান্ত, প্রেমের অভিনয় আমি স্বেচ্ছায় করি নি। মণিকা এবং ক্লাসের অন্যান্য মেয়েরা আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার কথা ছিল তোমাকে আমার কাছে হার স্বীকার করাবো। তুমি আমাকে ভালবাসবে, তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করবো। তাই, তোমার পেছনে অত সময় নষ্ট করেছি, নইলে খেলাবারও যোগ্য তুমি নও।"

প্রশান্ত আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইল। কমনীয় মুখে তাহার কি অসহ ঘৃণা! যে চোখে আমার জন্য আদর-জড়ানো, পুষ্প-কোমল দৃষ্টি সঞ্চিত ছিল আজ তাহা অশনি বর্ষণ করিল—

"তুমি এই? ছিঃ! অথচ আমি তোমাকে এত ভালবেসেছিলাম। আজ কিন্তু ঘৃণা ছাড়া আমার মনে আর কিছুই নেই।" হাতের জ্বলন্ত সিগারেট প্রশান্ত জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। কনিষ্ঠার হীরার আংটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ অসংলগ্ন পদচারণ করিয়া আমার সম্মুখে আবার সে দাঁড়াইয়াছে। ক্রোধে ঘৃণায় প্রদীপ্ত এই প্রশান্তকে আমি চিনি না। আমার সমবয়স্ক, ফুলের মত কোমল তরুণ এত ঘৃণা করিবার শক্তি কোথা হইতে পাইল?

"জীবনে কিছুই তুমি ভালবাস নি নিজেকে ছাড়া। মেয়েরা চিরকাল 'একো' রূপেই দেখা দিয়েছে, আর পুরুষ 'নার্সিসাস্' রূপে। একো ভালবাসে নার্সিসাস্‌কে, নার্সিসাস্ জলের মধ্যে নিজের মুখের

ছায়ার প্রেমে মত্ত। একোর দিকে সে ফিরেও চায় নি। মেয়েরাও যে নার্সিসাস্ হ'তে পারে তার প্রমাণ তুমি। নিজের রূপকেই ভাল বেসেছ, তাই তুমি নার্সিসাস্। নার্সিসাসের অভিশাপই তোমার ওপর রইলো, নার্সিসাস্! শেষ কথাটির ওপর সমস্ত বিষ ঢালিয়া বিদ্যুৎগতিতে সে বাহির হইয়া গেল।

সেই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। তাহার পরই সে যুদ্ধের বিমানবহরে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

আজ নিরালা রাত্রে তাহাকে মনে পড়িতেছে। আমার চারি পাশে তাহার অন্তরাত্মা যেন খুঁজিয়া মরিতেছে, যদি সভ্যতার জয়পতাকা এই দেহে কিছুমাত্র হৃদয় অবশিষ্ট থাকে! সে দূরে গিয়াছে, কিন্তু আজিকার ক্ষীণ-চন্দ্রালোকিত যামিনী তাহার আভাস-স্বপ্নে এখনো বিভোর। আজও বাতাসের দ্রুত স্পর্শে অকারণে তাহাকে কেন মনে পড়ে!

মনে হয়, তাহার ভুল হইয়াছে, আমি নার্সিসাস্ নই। কেন সে আর একটু অপেক্ষা করিল না? জীবনে একমাত্র তাহাকেই ভালবাসিতে পারিতাম।

সেমেলি

আচ্ছা, আমি এখানে কেন? প্রসাধন-টেবিলের সম্মুখে আবক্ষ অনাবৃত নিজের মূর্তির দিকে চেয়ে মেয়েটি আপন মনে বলছে, শ্রোতা তার স্বচ্ছ মুকুরে স্বীয় প্রতিবিম্ব।

মর্মরশুভ্র কোল্ডক্রীম তর্জনীতে তুলে গণ্ডে মার্জনা করতে করতে মেয়েটি ব'লে যাচ্ছে, আচ্ছা, আমি এখানে কেন? কেন আমি এই সাঁওতাল পরগণার অখ্যাত ছোট শহরে? আমার স্কুল প'ড়ে রয়েছে সুদূর কলকাতায়। আমি কেন এই পাড়াগাঁয়ে গভীর রাত্রে ব'সে নীলার ড্রেসিং-টেবিল ব্যবহার করছি?

বাহিরে অন্ধকার সমুদ্রের মত সীমাহীন। ঝড়ের বেগে হাওয়া ঝাউগাছকে আঘাত ক'রে যাচ্ছে।

জানি, তুমি পালিয়ে এসেছ। তুমি ব'লে আস নি, তুমি ঠিকানা দিয়ে আস নি।—আয়নায় প্রতিফলিত মূর্তি কম্পিত অধরে বললে।

না, আমি এসেছি স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য। আমার অসুখ করেছে, আমি অসুস্থ। দিনের আলোতে চেয়ে দেখো আমার দিকে। চোখের দৃষ্টি আমার নিষ্প্রভ, মালিন্য আমার ত্বকে। যৌবন-লালিত্য আমার বাইশ বৎসরের দেহে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখছ না বিশীর্ণ করাঙ্গুলি? আমি অসুস্থ।—শিথিল অঞ্চল তুলে মেয়েটি সতেজে প্রতিবাদ করলে।

কিন্তু অসুখটা করেছে কেন? পালিয়ে থাকবার জন্য নয়?

ডাক্তারের শিশি শিশি ওষুধ গলাধঃকরণ করলে রোগ সারে না।—ছায়া অর্থপূর্ণভাবে হাসল।

অসুস্থ তো কলকাতা থেকেই, পালানো কথাটার মানে কি?

আয়নার মেয়েটি আবার হাসল, পালানো তো সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

আমার অসুখ ভাল হচ্ছে না কেন? সত্যিই আমি বড় অসুস্থ। এ হৃদয়ঘটিত দুর্বলতার জন্য প্রবাস নয়, বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে। তাই তো অসময়ে স্কুল থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি পেলাম। পড়াতে আর পারতাম না, কবে পারব জানি না।

বয়স্থা কুমারীদের এ রকম শখের অসুখ হয়, না?

শখের অসুখ? আচ্ছা, দেখ।—মেয়েটি দেহ হ'তে অঞ্চল নামিয়ে দিলে। সম্মুখের প্রতিচ্ছবির শুভ্র গাত্রে দেখা গেল অসংখ্য চক্রাকার স্ফীতি, সারা দেহে যেখানে সেখানে। সমস্ত চর্মের উপর রক্তিম আভায় সেগুলি বিষদহনের পীড়া দিচ্ছে।

দেখ, আমার শখের অসুখ! জান না এর যন্ত্রণা? একে বলে 'আর্টিকেরিয়া'। পিত্তচাকার অশ্বস্তি জান? সারা দেহে মনে হয়, আগুন জ্ব'লে উঠেছে। সতীরা কি সহমরণের অগ্নিদাহ এর চেয়ে বেশি অনুভব করেছে? ওঃ, কি নিদারুণ যন্ত্রণা! সমস্ত শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়!—অসংলগ্ন, ব্যগ্র করাঙ্গুলিতে মেয়েটি স্ফীতিগুলিকে সবেগে পীড়ন করতে লাগল পাগলের মত। নখর-লাঞ্ছিত স্থানে ফুটে উঠল রক্তচিহ্ন।

ডাক্তার বলেছে, 'ইন্‌টেস্টাইনাল অ্যালার্জি', তাই এই সব। তাই তো আহারাদির পর অসহ্য ব্যথা ওঠে হৃৎপিণ্ডের নীচে থেকে।

সে ব্যথা অবশ ক'রে দেয়। আর সহ্য করতে পারি না, আর সহ্য করতে পারি না।

নীলা কবি, আমি কবি নয়। নিজের অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করবার পৈশাচিক বিলাস আমার হ'ত না কবি হ'লেও। স্বামীর চাকুরি-স্থল এই জঙ্গলে প'ড়ে থাকলেও নীলার কবিতার হাত নষ্ট হয়ে যায় নি। তার প্রমাণ শোন—

বেদনার সিন্ধুতলে ডুবে যাই আমি,
প্রতি অঙ্গে জড়িমার মন্দ আন্দোলন,
পদতল আকুঞ্চিত হয় ক্ষণে ক্ষণে,
বেদনায় কেশমূলে বাজে শিহরণ।

অঙ্গুলির বৃন্ত যেন নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়—
অর্ধচন্দ্র নখরেতে অগ্নির প্রদাহ,
অধর বিশুষ্ক আর কম্পিত ব্যথায়,
দূরে গেছে দৈনন্দিন জীবন-উৎসাহ।

বক্ষ জ্বলে অনির্বাণ খাণ্ডব-দাহনে,
অন্ত্র যেন বর্শাবিদ্ধ বেদনার রণে,
কণ্ঠ হয় শ্বাসহীন ; বৃশ্চিকের জ্বালা
শত শত অনুভূত দেহ-কণ্ডুয়নে।

বেদনার সিন্ধুতলে অচেতন আমি—
ভাল কেহ বাস যদি দেখ সিন্ধু জলে,
যে তনুতে অমৃতের পরম প্রকাশ,
বিষের সাগর আজ ওঠে পলে পলে।

আমারই শারীরিক যন্ত্রনার বর্ণনা। আমাকে লক্ষ্য ক'রে দেখে আমার কাছে শুনে নীলা লিখেছে। কেমন, এখন বিশ্বাস হ'ল আমর রোগের কাহিনী? জানি, কাব্য ক'রে বললে বলবার কথার মূল্য অনেক বেড়ে যায়।

হয়তো ভাল হব না, এই রোগজীর্ণ দেহ টেনে টেনে ক্লান্তির চরম সীমায় অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর জন্যে। ভাল হব না, সুস্থ শরীর কাকে বলে জানব না। ধ্বংস আমার সমাগত।

না না, ভাল আমি হবই। আমার কিছু হয় নি। সামান্য সাময়িক অসুখ মাত্র। ভাল আমাকে হতেই হবে। আবার ফিরে যাব নগরীর উন্মত্ত জীবনযাত্রায়। প্রমাণ করিয়ে দেব, প্রেম আমাকে ধূলাশায়ী করে নি।

প্রেমের সঙ্গে সম্পর্ক কি? সম্পর্ক নেই। আমি এসেছি আমার মাসতুতো বোনের কাছে শরীর সারাতে। নীলা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করছে, জায়গাটি ভাল। তবু ভাল হচ্ছি না।

প্রেম কর, তাই হচ্ছে তোমার বয়সী কুমারীর লিভারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ টনিক! ভালবাসা পাও নি বুঝি?

ভালবাসা পাই নি? অত ভালবাসা স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করে নি। শিশুকাল থেকে প্রেমের যেসব উপাখ্যান পড়ে লুব্ধ হয়েছি, তাদের মলিন ক'রে দিয়ে কি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব হয়েছিল! নিঃসঙ্গচিত্তে দেবরূপ ধারণ ক'রে এনেছিল প্রেম—বাসনাবিহ্বল, কামনাপুলকিত। আজও একাকীশয্যা আমার স্মৃতিমন্দির।

কোথায় ছিলাম আমি? একটা বাড়ীতে—চার নম্বর কলুটোলা ষ্ট্রীট আজ কত দূরে? আমার সেই একা শোবার সেকেলে প্যাটার্নের খাট, মাথার কাছে একটা কাঠের পরী ক্ষোদিত।

আমার কালো কাঠের আলমারি, বইগুলি অপেক্ষা ক'রে থাকত কখন আমার অবকাশ হবে। সে সব এক মাসেই স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। আছে সত্য হয়ে এই পাহাড়ী দেশের রক্তধুলি আর নীলার প্রসাধন-টেবিল।

জুপিটার! জুপিটার! কেন আমার জীবনে এলে অকস্মাৎ? কেন আমি আমার নিজমূর্তি দেখতে চাইলাম? সেমেলি, তাই আজ ভস্ম তোমার অবশেষ।

তোমাকে সে প্রথম দিন বলেছিল, পড়ানোর লাইনটা আপনার কেমন লাগে?

তুমি উত্তর দিয়েছিলে, ভাল। নইলে নেব কেন?

তরবারি সহসা কোষমুক্ত হতে দেখেছ? শুভ্র দন্ত—যেন দংশন করবার জন্য তাদের সৃষ্টি হয়েছে, পরে বহুদিন দেখেছিলে তাদের সক্রিয়তা খাদ্যগ্রহণের সময়ে। তখনি মনে হ'ত, হয়তো কিছু নিষ্ঠুরতা আছে কোথাও অন্তরালে। হেসে উঠেছিল জুপিটার। তারপরে কমলদানি থেকে লাল-নীল পেন্সিলটা নিয়ে লোফালুফি করেছিল সহাস্যে। কি ছেলে মানুষ! প্রৌঢ় পুরুষের অত ছেলেমানুষি!

তোমার অখ্যাত কর্মস্থল নবীন শিক্ষায়তনটির সে ছিল সেক্রেটারি, দেখা করতে গিয়েছিলে তার বাড়িতে মেয়েদের নাটক-অভিনয় সম্পর্কে কথাবার্তার জন্য। নূতন শিক্ষয়িত্রী তুমি, উৎসাহ ছিল প্রবল।

বসবার ঘরে দেখা হ'ল নির্জন বড় বাড়িতে। সারি সারি পরিচারকদের মধ্যে দিয়ে বার হ'লে লাল কাপড় মোড়া চৌকি যেখানে।—বলিদানের রক্তময় বেদী যেন।

সে দেখা দিলে বিদেশী পোশাকে। রৌদ্রের আলোতে ললাটের পার্শ্বে দুই একটি রূপার চুল। ওষ্ঠাধর পুরুষের পক্ষে বেশী আরক্ত, নয়নে রাত্রির গভীর তমিস্রা। দীর্ঘ গৌর দেহ, প্রশস্ত স্কন্ধের ওপরে প্রকাণ্ড মাথা—রাজকীয় মূর্তি। অধরে তার কত প্রেমের নিষ্ঠুর পরিতৃপ্তির ছায়া, নয়নে তার জীবনের বেদনার সুর। চিহ্নিত ললাটে অভিজ্ঞতা আর গাম্ভীর্য, যৌবনের খরদীপ্তি নেই, আছে তবু উত্তাপ। তোমার জুপিটার, সেমেলি।

যে নাটক তোমরা অভিনয় করতে চেয়েছিলে, সে তা আগে পড়ে নি।—আপনি সময় করে প'ড়ে শোনাবেন? নইলে মতামত দেব কেমন ক'রে, করা উচিত কিনা? আপনি অভিনয়ের ভার নিয়েছেন, এটা আপনার কর্তব্য। নিজে আমি কখনই প'ড়ে উঠতে পারব না। আসবেন?

সদ্য কলেজ-ফেরত তুমি। তোমার বয়স বাইশ। কোন কিছুই অসঙ্গত লাগে না তোমার, বিপত্নীক পিতা অর্থ পাঠান। কাকার বাড়িতে থেকে চাকরি নিয়েছ সম্প্রতি। সুতরাং তুমি স্বাধীনা।

পরের দিন সকালে এক ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বের হ'লে। স্কুলে যাবার পথে তার প্রাসাদে গিয়ে উঠলে। মনে ঈষৎ গর্বের ভাব ছিল, সেক্রেটারি নিজে ডেকেছেন।

প'ড়ে গেলে তুমি নীচু চৌকিতে ব'সে। মার্বেলের ত্রিপদিতে হাত রেখে এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল তোমার আন্দোলিত অধরের দিকে। ছোট নাটক, তাও পড়া শেষ হ'ল না। পরের দিন সন্ধ্যাতে সে সময় দিলে। সকালের দিকে আমার ডিরেক্টরদের মিটিং, বুঝেছেন? সন্ধ্যায় ফ্রী হব। আবার তাড়াতাড়ি না শুনে নিলে ওদিকে প্লে তৈরি করতেও যে আপনার দেরি হয়ে যাবে।

পরের দিন। আধো অন্ধকারে টেবিল-ল্যাম্পের আলো। দীর্ঘ, উজ্জ্বল-গৌর দেহ তার ধুতি-পাঞ্জাবি-মণ্ডিত, অর্ধশয়ান। আলস্যের জড়িমাশিথিল দেহ, যেন কত কষ্টে সংযত হয়ে আছে। প্রদীপ্ত দৃষ্টি তোমার অন্তস্তল দেখে যাচ্ছে, তোমার বস্ত্রাবরণ, তোমার রক্তমাংস সব কিছুর পেছনে তার গতি। সহস্র সূর্যের উত্তাপ তার দৃষ্টিতে। দেহ তোমার উষ্ণ হয়ে উঠেছিল সন্ধ্যার আবছা আলোতে। কে যেন তোমাকে আলিঙ্গন করছে! ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এতই সাংঘাতিক।

মনে ঘোর লেগেছিল। অনেকদিন আশ্চর্য লেগেছে তোমার অত তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়ের প্রেমে ব্যাকুল হবার জন্যে। সে প্রেম-নিবেদন করবার পূর্বেই তৃতীয় সাক্ষাতে তুমি তাকে ভালবেসেছিলে কেন সহসা? না, আজ তোমার বিস্ময় নেই। কটাক্ষে, ব্যবহারে সে তোমাকে প্রেম জানিয়েছিল, তোমাকে মোহিত করবার প্রচেষ্টা ক'রে চলেছিল একটি কথাও না ব'লে। তুমি সে প্রেম গ্রহণ করেছিলে মাত্র।

গর্ব হয়েছিল মনে, মোহ তাকে বলা চলে। শোন, আজ সত্য কথা স্বীকার কর।—আয়নার ছায়া নীরবে তিরস্কার করলে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে অহরহ তুমি চেষ্টা করেছ সারা জীবন ধ'রে। যে চিন্তা মনে অস্বস্তি আনত, সে চিন্তা তুমি একেবারে ত্যাগ করতে, জানি। সত্যের সম্মুখীন হবার সাহস তোমার ছিল না। মুখোমুখি কোন কিছুর প্রকৃত রূপ চোখ মেলে দেখা তোমার প্রকৃতির বিপক্ষে। নানা কথা ব'লে নিজের মনকে শিশুর ঘুমপাড়ানি ছড়ার প্রথায় ভুলিয়ে রাখতে ক্রমাগত। যে সব বিষয়ে পূর্বাহ্ণে চিন্তা আবশ্যক, পরে ভেবে দেখবে ব'লে সে সমস্ত ধারণা এক

কোণে ঠেলে দিতে। কর্মভীরু কেরানির মত কখনই তোমার হিসাবের খাতা মেলাবার অবকাশ হ'ত না। কিন্তু সেদিন নিজেকে ভুলিয়েছিলে ব'লে আজ তোমার এই পরিণতি। আজও আবার নিজেকে ভোলাচ্ছ তোমার অসুখটা শারীরিক ব'লে।

'টোরেন্টিল' লেখা, চ্যাপ্টা ছোট শিশি থেকে বাসন্তী বর্ণের একটি বড়ি বের ক'রে মেয়েটি জলের সাহায্যে গলাধঃকরণ করলে। পাশের টেবিলে ঝি হর্লিক্সের পেয়ালা রেখে গেছে।

মুখে পাত্র ধ'রে আয়নার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি আবার বললে, অসুখ নেই আবার? অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে, তা তো মিথ্যা নয়।

যন্ত্রণা কেন জান?—ছায়া উত্তর দিলে, অসুখ কেন জান? মন যা চাচ্ছে, জোর ক'রে শরীরকে তার থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে। যাও, ফিরে যাও সেই কামনা-ব্যাকুল বন্ধনের মধ্যে, লাগুক তোমার অধরে তার শোণিত অধরোষ্ঠ। পালিয়ে এসেছ, আবার ভান করছ অসুখ সারাতে এসেছ ব'লে। পালিয়ে আসবার প্রয়োজন ছিল না, আকর্ষণকে প্রতিহত করার শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তোমার।

সেই ম্লান বিজলী-আলোতে প্রেমের জন্ম হ'ল তোমার জীবনে, তোমার হৃদয়ে। সমস্ত কথা তোমার ধীরে ধীরে সে জেনে নিলে, তুমি কিছুই জানলে না সেদিন। নির্জন বাড়ি, বয়স্ক পুরুষ—বিবাহিত কি না বারে বারে সে প্রশ্ন চাপা দিলে অনিশ্চিততার ভীতিতে। থাক আমার সুখস্বর্গ মনে মনে, যতক্ষণ তার পরমায়ু। নির্মম সত্য শুনতে চাই না। দরিদ্রকন্যা তুমি। বাড়ি, গাড়ি, আসবাব তোমার চোখ ঝলসে দিল। প্রতাপশালী প্রৌঢ় পুরুষ, তোমার কর্মস্থলের এবং বহুর দণ্ডকর্তা বিধাতা। সে তোমাকে অকপটে

পছন্দ করেছে! সে তোমাকে রবিবারে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে! তোমাকে—নগণ্য স্কুল-শিক্ষয়িত্রীকে, যৌবন ভিন্ন যার কোন সম্পদ নেই!

মোহ হয়েছিল তার অসামান্যতায়, গর্ব হয়েছিল তোমার কাছে সে সহজপ্রাপ্য ব'লে। ভেবেছিলে, অথবা নিজের মনকে স্তোক দিয়েছিলে এই ভাবনা দিয়ে—স্কুলের সেক্রেটারি উনি। ওঁর সুনজরে থাকলে আমার অনেক লাভ হবে। ওঁকে সন্তুষ্ট রাখা আমার অবশ্যকর্তব্য।

না, আজ স্বীকার কর, প্রৌঢ় পুরুষের আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলে তুমি। এখন সেই আগুনে পুড়ে মর। ওই যে তোমার দেহে অগ্নিদহনের জ্বালাময় অসংখ্য মাংসপিণ্ড, সে জুপিটারের বজ্রাগ্নির চিহ্ন, আর্টিকেরিয়া নয়।

রবিবার সন্ধ্যায় গিয়েছিলে, চায়ের পক্ষে সময়টা বিলম্বিত। সেই রক্তিম সোফা-সেটি, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে মলিন আলোক। হলদে পাত্রে সোনালী চা, চুলের সুরভি, চুরুটের আগুন, আর নির্নিমেষ-দৃষ্টি সমাহিত জুপিটার!

—আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ। ছেলেমেয়েকে নিয়ে উনি এখন আছেন কার্সিয়ং।

অবশেষে চরম কথাটা তুমি শুনলে। বিবাহিত। যন্ত্রণায় মনে হ'ল মৃত্যু হয়েছে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে এল সে, তোমার আসনে দুই হাতলে ভার রেখে ঝুঁকে পড়ল তোমার সামনে—তাতে কোন ক্ষতি হয়েছে আমার স্ত্রী আছে বলে?

লাভক্ষতির প্রশ্ন তখন ওঠে না। সে অন্ধ আকর্ষণে তোমাকে যতদূর সে যেতে চায় টেনে নেবেই—রসাতলে পর্যন্ত।

প্রথম চুম্বন সেই দিনেই।

যার স্ত্রী আছে, তাকে ভালবাসা কি উচিৎ? কি হবে এই ভালবাসায়, যার কোন পরিণতি নেই? এসব প্রশ্ন মাঝে মাঝে খোঁচা দিত মনে। কিন্তু তখনই তা চাপা দিতে। যা ভাল লাগে না, কেন ভাবব? যা ভাল লাগছে কেন ক'রে যাব না? ভবিষ্যৎ ভাববার নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে না তুমি, বর্তমানকে উন্মাদের ব্যগ্রতায় ব্যবহার ক'রে যেতে ক্রমাগত। যা হয় হোক, দিন কেটে যাচ্ছে আনন্দে। এ আনন্দ কেন নেব না? যা হয় হবেই। মিথ্যা ভেবে আগের চেয়ে কষ্ট পাই কেন?

তার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে। তাঁর ওপরে কি অবিচার করা হচ্ছে না? ওসব কথা ভাবতে পারতে না, বুকে যেন ব্যথায় মোচড় লাগত। তাই ভাবতে না ইচ্ছে ক'রে। যেন তার স্ত্রী বায়ুর মতন একটা অনুভূতিগ্রাহ্য পদার্থ মাত্র, কোন বস্তুতান্ত্রিক রূপ তাঁর নেই; এই ভাবে চলতে তুমি। তার ছেলে-মেয়ে? ছেলে আছে, আশ্চর্য! এই প্রেমিকের সন্তান আছে, সে পিতা! বেসুরেতে সব কিছু বেজে উঠত তোমার। তাই ভুলে থাকতে তার প্রবাসী সন্তানদের কথা, সেও ভুলেও তার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলত না। শবাধারে নিহিত আবৃত শবের মত তোমাদের মধ্যে সে জীবন প্রোথিত থাকত। প্রেতমূর্তি ধ'রে কখনও তোমাকে পীড়ন করে নি। কি প্রথায় প্রেম করতে হয়, জুপিটারেরা তা জানে।

দীর্ঘ মোটরভ্রমণ, নৈশ-আলাপন, চিত্রগৃহে—চায়ের দোকানে

একত্র সমাগত, বসবার ঘরে ক্রমশ-চুম্বন—দিনগুলি নেশায় কেটে যেতে লাগল। অবশেষে একটি বিন্দুতে তোমার সমগ্র জীবন এসে স্পর্শ করল—সে।

মনকে ভোলাতে খেলা করছ তুমি, যখন খুশি তখন এ খেলাঘর ভাঙলে চলবে। কিন্তু খেলা শুধু সহস্রবল্লভ জুপিটার জানে; সেমেলি কখনও খেলা শেখে নি, শুধু শিখেছিল প্রণয়ীকে সর্বতোভাবে পাবার চেষ্টা। তাই গ্রীক পুরাণে সেমেলি ভস্ম হয়েছিল। সেও তোমারই মত দেবশ্রেষ্ঠ জুপিটারকে ভালবেসেছিল। জুপিটার তাকে নিজমূর্তি গোপন ক'রে কোমল মাধুর্যে ধরা দিয়েছিলেন। জুপিটার-পত্নী জুনোর ঈর্ষামন্ত্রণায় সেই সেমেলি প্রণয়ীর নিজমূর্তি দেখতে চাইলে। দেবতা এলেন বজ্র-অগ্নি নিয়ে। সেমেলি দগ্ধ হ'ল। এ আখ্যায়িকাতে জুনো অদৃশ্য। কিন্তু সেমেলি, তোমার পরিণতি ওই ভস্ম।

কাকীমা বিরক্ত হতেন, কাকা রাগ করতেন, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্বের ভার তাঁদের হাতে ছিল না। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলেও এসব কথা কিছু কিছু বোঝা যায়। তোমার আরক্ত কপোল, উজ্জ্বল নয়ন, লোলুপ অধর ধরিয়ে দিত তোমার প্রেমের ইতিহাস। সহকর্মিনীরা বক্র পরিহাস করতেন, কোন কোন বর্ষীয়সী কুমারী ঈর্ষাকুল হতেন। তোমার জগতে কিন্তু আর কিছুই ছিল না—ছিল জুপিটারের মানবাতীত প্রেম। দেহ তোমার হয়ে উঠেছিল বিকচকদম্ব, মন অলস। দেহের সামান্যতম অনুভূতি হয়েছিল তীব্র, মানসিক জড়তা কিন্তু চিত্তকে ভাবনার অবকাশ দিত না। চিন্তা না করতে করতে চিন্তার শক্তিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

সে স্বপ্নজগৎ ভেঙে গেল তোমারই নির্বুদ্ধিতায়, তোমারই মূঢ় কৌতূহলে, সেমেলি তুমি। যে জগৎ স্বপ্ন দিয়ে সৃজন করেছিলে, তার সঙ্গে বাস্তবের বিষম পার্থক্য দেখলে। কাচের বাসনের মতো তোমার প্রেম ঝনঝন ক'রে টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সহ্য করতে পারলে না, মোহভঙ্গে পলায়ন করলে। আর দেখা করতে না, টেলিফোন ক'রে নানা অজুহাত দেখাতে। নিজের হৃদয় নিয়ে নিঃশব্দে স'রে থাকতে, রোগ হ'লে যা স্বাভাবিক। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে পলায়ন করলে। জুপিটারের মানবাতীত আশ্চর্য প্রেম তোমার সহ্য হ'ল না।

সেই দিনটি! ডায়মণ্ডহার্বারের পিক্‌নিক সেরে সন্ধ্যায় তোমরা গিয়েছিলে জুপিটারের গৃহে। মদির প্রেমাবেশের মধ্যে কেন জানি না ব'লে উঠলে, তোমার নিজের শোবার ঘরটা আজ দেখব। কোন দিন দেখি নি।

তার জীবনের কোণগুলি পর্যন্ত তোমার আয়ত্তে আনা চাই, না? নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে তাকে তুমি কল্পনা করতে চাও আরও অন্তরঙ্গ পরিবেষ্টনীতে, যেখানে সে রাত্রি যাপন করে, যে শয্যায় জাগ্রত জুপিটারেরও নয়নে নিদ্রাবেশ আসে, কি বল?

সে মুখ তুলে তোমার দিকে চেয়ে হাসল। আবার সেই নিষ্ঠুর দন্তশ্রেণী যেন হিংস্র আনন্দে উন্মোচিত দেখলে—শেষ বার।

—দেখাব। তবে আজ থাক।

যতটুকু সে দিয়েছিল, তাতে কেন সন্তুষ্ট রইলে না? কেন তার স্বকীয়তার চরম সীমা দেখতে চাইলে, নির্বোধ?

তুমি জোর করতে লাগলে আবদার ক'রে,—না, আজই। আমি বুঝি তোমার শোবার ঘর দেখব না? এতদিন যে কেন মনে হয় নি!

সে লঘু স্বরে উত্তর দিলে,—আগে ঘর তোমার দেখার উপযুক্ত করি, তারপর। চাকরদের হাতে রয়েছি, কোন কিছুই ঠিক সাজানো থাকে না।

তুমি অনুযোগ করলে,—আমি বুঝি তোমার পর যে, ঘর সাজিয়ে দেখাতে হবে?

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জুপিটার সহাস্যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তোমার আবদার আর ছেলেমানুষি দেখে যেমন সে চেয়ে থাকে। দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টি-সম্মোহনে। আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে,—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নিজেই যাচ্ছি। ওপরে যে ঘরটায় লাইব্রেরি, তার পাশেরটা তো? চললাম।

হাত নেড়ে তাকে উত্তেজিত ক'রে দ্রুতচরণে দ্রুতধাবনে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে লাগলে। তোমার লীলায়িত গতিভঙ্গির দিকে চেয়ে জুপিটার ভুলে গেল তার মনে যা ছিল। তোমাকে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু প্রসারণ ক'রে তোমার পেছনে সেও প্রধাবিত হ'ল। হাস্যকলরোলে সিঁড়ি মুখরিত হয়ে উঠল।

প্রবেশ করলে জুপিটারের নিভৃত-নিকেতনে। শুভ্র শয্যা আস্তৃত, দুজনের মতো পালঙ্কে। পাশে ছোট রেলিং দেওয়া খাট, দুইটি প্রবাসী শিশুর নৈশ-নিদ্রাস্থল। চকিত চরণ তোমার স্তব্ধ হয়ে গেল। আয়নার পার্শ্বে সুন্দরী তরুণীর আপাদমূর্তির প্রতিকৃতি। সযত্নবিন্যস্ত কেশপাশ থেকে পায়ের উচ্চ-হীলের জুতা পর্যন্ত তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় তাতে লেখা রয়েছে, সেমিলি, সে তোমার জগতে স্বপ্নেরও অতীত। পরিপূর্ণ নারীমূর্তি, নয়নে সন্ধানী কটাক্ষ, হাসি তার অভিজ্ঞ, বাসনা-জড়িত। এই জুনো, স্বর্গসম্রাজ্ঞী জুনো, জুপিটারের উপযুক্ত সঙ্গিনী। আর তুমি? তার কাছে

তুমি। অন্য পার্শ্বে যুগলমূর্তি—সেই তরুণী আর তোমার জুপিটার, অর্ধ-আলিঙ্গনে উভয়ে প্রেমবিহ্বল। ছোট ত্রিপদীর উপরে দুটি শিশুমূর্তির চিত্র—নিষ্পাপ, কোমল পুষ্পের মত সুকুমার। তাদের স্ট্যাণ্ডে-রাখা ছবির নীচে খোলা অবস্থায় চাপা দেওয়া রয়েছে একখানা চিঠি। সদ্য এসেছে, তাড়াতাড়িতে মালিক পড়া শেষ করে ওই ভাবে রেখে গেছেন। শিশু-হস্তের বড় বড় অক্ষরে আঁকা বাঁকা লেখা, পড়তে তোমার কষ্ট হ'ল না, পড়তে তুমি দ্বিধা করলে না। এক নিমেষে তোমার পড়া হয়ে গেল—

বাবামণি,

কেন তুমি এত দিন আসছ না? মায়ের খুব রাগ হয়েছে তোমার ওপরে। এবারে এলে তোমার সঙ্গে মা কথা বলবে না, জান? কবে তুমি আসবে শিগ্‌গির লিখো। আমাদের বাগান শেষ হয়ে গেছে, সেবারকার মতো তোমায় কিন্তু ঘোড়া হতে হবে। আমরা তোমার পিঠে চড়ব।

তুমি মাকে যেমন একটা ভেল্‌ভেটের থলে দিয়েছিলে, তেমনি দুটো আমাদের জন্যে আনবে। আমরা পাথর কুড়িয়ে রাখব। আমরা ভাল আছি। তুমি চিঠি পেয়েই চলে আসবে।

তোমার বাবুল, রুবি

এই জুপিটারের নিজ আবেষ্টন। এই জুপিটারের স্বকীয় মূর্তি। জুপিটারের নিজ মূর্তি দর্শনে সেমেলি ভস্মীভূত হয়ে গেল।

এই তো আমার গল্প, আর নেই। তা হ'লে সমস্ত জান তুমি? প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, শুনলে তো? ছাই হয়ে গেছি। জীবনে জুপিটারকে ভুলতে পারব না।

কিন্তু আমি জানি, তুমি ভুলে যাবে। আমি জানি, যে তোমার জীবন-ইতিহাস লিখছি, সে তুমি একদিন ভুলে যাবে। গ্রীক পুরাণ-কার শুধু ভস্মস্তূপ দেখেছিলেন। ভস্ম থেকে জাত ফিনিক্স তাঁদের চোখে পড়ে নি। ভস্মের শেষ ভস্মই নয় সেমেলি। আমি জানি, নূতন প্রেম তোমার দিগন্ত-সীমায় আবার দেখা দেবে। আমি জানি, তুমি ভুলে যাবে।

মহাশ্বেতা

একটি ডাইরি হইতে—

'তুমি আমাকে Green Hat' পড়্তে বলেছিলে। মাইকেল আর্লেন-এর লেখা আমার ভাল লাগে না। তাই তখন তোমার কথায় মনোযোগ করি নাই। ইংরেজি মাসিকে আলেন-এর লেখা-গুলি না পড়ে বাদ দিয়ে রেখেছি এতদিন।

কিন্তু আজ তুমি দূরে গেছ তাই তোমার সামান্য কথাও আজ আমার কাছে অমূল্য।

'Green Hat' পড়েছি। প্রথম দেড়শো পাতা ভাল লাগ্ল না। তারপরে দেখলাম আশ্চর্য। দেখলাম মানব-মনের শাশ্বত প্রেম-পিপাসা ও প্রথম ভালবাসার গভীর অনুভূতি নিয়ে আধুনিক যুগের যন্ত্রসভ্যতা ও অবিশ্বাসের মধ্যে লেখক এক অভিনব স্বপ্নজগৎ রচনা করেছেন।'

টেবিল ল্যাম্পের নীলাভ আলো আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিভাশালিনী লেখিকা ললিতা দত্তের কালো চুলে প্রতিফলিত হইতেছে। শুভ্র বসনাঞ্চল লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে ধূল্যবলুণ্ঠিত। আভরণশূন্য দীর্ঘ গ্রীবাকে বেষ্টন করিয়াছে গৈরিক রেশমের জামা। গজদন্তসন্নিভ গাত্রবর্ণ অনামিকার মুক্তার মতই প্রদীপ্ত।

ললিতার ক্ষীণ দেহ তপস্যালাঞ্ছিত ব্রহ্মচারিণীর কৃচ্ছ্রম্লান। উদ্দাম যৌবনও যেন ঔদাস্যের নিয়ম-রজ্জুতে দেহতটে সুপ্ত।

হাতের লেখনী নামাইয়া কোণে-রাখা ঘড়িতে ললিতা সময় দেখিল—রাত্রি বারটা। মধ্য রাত্রি।

তাহার জীবনেও আজ মধ্য রাত্রি। যৌবন প্রেমের প্রভাতী

স্বপ্নের বহু দিন অবসান ঘটিয়াছে। তাহার জীবনে আজ সাফল্য আসিয়াছে। তাহার রচনা-নৈপুণ্যে পাঠক সমাজ মোহিত হইয়াছেন, সমালোচকেরা প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার শিল্পসাধনা রচনাশিল্পের পথ ধরিয়া চিত্তের বহুপ্রার্থিত পরিপূর্ণতাকে লাভ করিতে চলিয়াছে। বহু উদাসীন ক্ষণের গোপন ইঙ্গিতে সে তথা-কথিত সমাজ-জীবন ত্যাগ করিয়া অলঙ্ঘ্য শক্তির নির্দেশে সাহিত্যিক হইয়াছে। ধন্য ললিতা! কিন্তু জীবনে পরিপূর্ণতা কি কেবল শিল্পে ? শিল্পীমনের পূর্ণতা প্রেমে। প্রেমবঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আজ শিল্পকেই আশ্রয় করিয়াছে। তাই ললিতা দত্ত বড় লেখিকা।

ললিতা সাধারণ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের দুহিতা। তাহার পিতা অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক, ভ্রাতা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। ললিতা সাচ্ছল্যের সহজ আবেষ্টনে কলিকাতাতে বাস করে।

তিন বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ললিতা সংস্কৃত কাব্যে এম. এ. পাশ করিয়াছে। সাহিত্যিক ও লেখক-খ্যাতি তাহার সাম্প্রতিক। রূপ ভিন্ন উল্লেখযোগ্য ললিতার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে কাহারও চোখে পড়ে নাই। বিশিষ্ট রচনাশক্তির প্রকাশ তাহার কিঞ্চিৎ চমকপ্রদ। লেখার অজুহাতে ললিতা তাহার পূর্বের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা প্রণালী ও সমাজ-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পড়িবার ঘরটি তাহার রাজত্বে পর্যবসিত। বিবাহ-বিতৃষ্ণা তাহার ঘৃণায় রূপান্তরিত হইবার পথে।

কিন্তু কেন অতি-সাধারণ একটি মেয়ে,—যাহাদের আমরা প্রতিদিন ট্রামে অথবা বাড়ির গাড়িতে চড়িয়া শিক্ষানিকেতনে যাতায়াত করিতে দেখি, যাহারা পরবর্তী জীবনে ধনী স্বামীর গৃহে সংখ্যাতীত চায়ের আসর সাজায় এবং পুত্রবধূ পরিবৃত অবস্থায়

বিজলীপাখার নিচে পরচর্চায় জীবনের শেষার্ধ কাটায়—এইরূপ একটি সাধারণ মেয়ে, সহসা সে নির্দিষ্ট জীবন ত্যাগ করিয়া শিল্পীর জীবন বাছিয়া লইল ? সহসা কেন মধ্যরাত্রে রহস্যময়ী সাজিয়া পার্ক সার্কাসের ইঁটকাঠের বাড়িতে বসিয়া সে অস্বাভাবিক ডাইরি লেখে ? অবশ্য ইহার একটি ইতিহাস আছে। খদ্যোৎ চন্দ্রকে চাহিবার পূর্বে যথারীতি দীপশিখাকে ভজনা করিয়াছিল।

ললিতা কলম তুলিয়া লইল। সম্মুখে রক্ষিত খোলা ডাইরির পাতায় তাহার সাহিত্যিক মনের ছায়া দেখা যায়—

'তুমি আমাকে যেসব বই পড়্‌তে বলেছিলে একে একে আমি সে-সব বই পড়ে ফেলেছি। তোমাকে এ কথা জানাবার উপায় আমার নেই। কিন্তু যখন প্রতি রাত্রে তোমাকে উদ্দেশ্য করে খাতায় এসব কথা লিখে যাই, তখন মনে হয় আমি একা নই। তুমি আমার কথা শুনছ। জানি লোকে আমার এই ডাইরি লেখার কথা শুনলে আমাকে পাগল ভাববে। কিন্তু, এ ছাড়া আমি যে সত্যি সত্যি পাগলই হয়ে যাব।

আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করে যাচ্ছি।

আজ 'আলোছায়া'-রচয়িত্রীর বেদনা বুঝি, যেমন তিনি বুঝেছিলেন 'কাদম্বরীতে' মহাশ্বেতার দুঃখ। কামিনী রায়ের কাব্য 'মহাশ্বেতার' উৎসর্গ-পত্রের দুই-একটি পংক্তি আমিও তোমাকে শোনাই'—

"একলাটি বসে থাকি যবে
আধেক নিদ্রায়,
অচ্ছোদের তরুণ তাপসী
দেখা দিয়া যায়।

হেরি তার সজল নয়ান,
শুনি মৃদু কথা,
বুঝি তার প্রণয় গভীর
নিদারুণ ব্যথা।"

*　　　*　　　*

অচ্ছোদ সরসী তীরে শ্বেত মর্মর দেউল। পত্রপল্লবে কূজনমুখর বিহগকুল। মণিদর্পণের ন্যায় স্থির জলধারা বৃক্ষবল্লরীর প্রতিচ্ছবি বক্ষে ধবিয়া অতীত স্মৃতি-বিভোর। লতাকুঞ্জের পার্শ্বে রহস্যবিজড়িত বিলাপধ্বনিতে বীণা বাজিতেছে। উন্মনা বাতাস যেন কাহার সর্ব-হারা রিক্ততার ব্যথায় হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে।

দেবাদিদেব মহেশ্বরেব মন্দিরে তপস্বিনী গন্ধর্ব রাজকন্যা মহাশ্বেতা। প্রিয়-বিরহে শুভ্র তনু তাহার বিশীর্ণ, রূপজ্যোতি ম্লান। কমলাসম্ভব পুণ্ডরীক জন্মজন্মান্তরে মহাশ্বেতার প্রিয়তম। অশাসিত জীবনের অভিশাপ পুণ্ডরীককে ধ্বংস কবিয়াছে, তাই মহাশ্বেতা বিবহিণী। কিন্তু প্রেম জন্মান্তরজয়ী, কালেব শাসন তাহাকে ক্ষুণ্ণ করে, বিনাশ করিতে পারে না। প্রেমের পূর্ণ পরিণতির অপেক্ষায় চন্দ্রলোকে পুণ্ডরীকের দেহ এখনও রক্ষিত। চন্দ্রপীড়-সখা বৈশম্পায়ন কেবল বিগত জীবনের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া অচ্ছোদতীরে হারাণো দিনগুলি খুঁজিয়া মরিতেছে। সামান্য মানবসাহচর্যে শ্বেতকেতুসূত পুণ্ডরীক এ জীবনে শুকনাস-তনয় বৈশম্পায়নে রূপায়িত। তাই মহাশ্বেতা তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

কুমারীর দেহলতা রুদ্ধরোষে ও অপমানে কম্পিত। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে অভিশপ্ত বৈশম্পায়নের উপর দ্বিতীয়বার অভিসম্পাত নিক্ষিপ্ত হইল।

ঊর্ধ্বে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি মহাশ্বেতার দৃষ্টি, তাহার কণ্ঠে অভিশাপ-বাণী। নিকটে অপরাধী বৈশম্পায়ন। কোন্ বিস্মৃতির গহন অতল হইতে ভালবাসার কলগুঞ্জন তাহার কণ্ঠে আপনি ভাষা পাইয়াছিল। সেই তাহার অপরাধ। তপস্যাপূতা মহাশ্বেতা তাহাকে চিনিল না। সামান্য অপরাধে ভুল করিয়া গত জন্মের প্রিয়কে আবার জন্মান্তরের গ্লানিতে অভিশপ্ত করিল।

চন্দ্রের দিকে চাহিয়া তর্জনী প্রকম্পিত কবিয়া মহাশ্বেতা বলিতেছে—

"যেনৈব খলু হতবিধিনা অনিরূপিতে স্থানাস্থানবাদী শুক ইব বক্তুমেবং শিক্ষিতঃ, তেনৈব কিমিতি তস্যামেব জাতৌ ন ক্ষিপ্তো-ঽসি ?"

যে হতবিধাতা তোমাকে স্থান বিচাব না করিয়া শুকপক্ষীর ন্যায় প্রেমের বচনে শিক্ষা দিয়াছেন তিনি তোমাকে কেন শুকজন্মেই নিক্ষেপ করিতেছেন না ?

আশ্রমতরুলতা বাতাসে শিহরিয়া উঠিল। অচ্ছোদের স্ফটিক-স্বচ্ছবারি বেদনায় বিচলিত হইল। প্রসন্ন চন্দ্র মেঘগুণ্ঠনে কাল-রজনী তমিস্রায় আত্মগোপন করিলেন। হায় হতভাগ্য পুণ্ডরীক!

* * *

সেনেট হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রীতিসম্মেলন। পঞ্চবার্ষিক সংস্কৃতের ছাত্রী ললিতা দত্ত তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে হলের মহিলা আসন সজ্জিত করিয়া সমাসীনা। তাহার পার্শ্বে ষষ্ঠ-বার্ষিক ইতিহাসের ছাত্রী মুরলা দেবী।

মুরলার পিতার নাম কেহ জানে না। সে তাহার মাতার সহিত টালা ট্যাঙ্কের নিকটে একখানি ফ্ল্যাটে বাস করে। কি ভাবে

তাহাদের দিন চলে তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। কোন পুরুষ অভিভাবক তাহাদের নাই। শাড়ী ও ভূষণের প্রাচুর্যে মুরলার শ্যামদেহ প্রগল্‌ভ; নয়নের কটাক্ষে ও অধরের হাস্যে শ্লালতার অভাব।

ললিতা এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে যোগদান করিল। নির্লিপ্ত দৃষ্টি ও উদাসীন মুখচ্ছবি দেখিয়া মনে হয় সুন্দর দেখাইবার দুরূহ প্রয়াস ভিন্ন যেন জগতে তাহার আর কিছু করিবার নাই।

মুরলার অনর্গল হাস্য ও বচনবিন্যাসে ললিতার ভাবপ্রবণ চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল। মুরলা ললিতার হাতের হীরক বলয় নাড়িতে নাড়িতে ক্রমাগতই কথা বলিয়া যাইতেছিল—"তোমাদের ক্লাসের মেয়েদের কাছে শুনলাম তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছে রঞ্জন সেনের সঙ্গে। তিনি আবার আমার মাসতুতো দাদার বন্ধু। দাদার যেখানে জমিদারী তিনি সেখানকার ম্যাজিস্টেট।"

ললিতা ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল "ঠিক হয়নি। কথা চলছে মাত্র।"

"তাই বল ভাই, আই-সি-এস বিয়ে করে সুখ নেই। অজ পাড়াগাঁয়ে কেবলি ঘুরে মরতে হয়। মা বলেন, 'বাবাঃ আই-সি এস্ জামাই আমি চাই না।'—" ললিতার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া মুরলা তাড়াতাড়ি কথাটায় তালি দিল—"অবশ্য আমরা পাচ্ছি বা কোথায়? তোমার মতো তো আমরা সুন্দরী নই।"

হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া ললিতা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। একটি গানের পর আর একটি গানের ব্যবধানে বাড়ি হইতে অনায়াসে ঘুরিয়া আসা যায়। ছেলেদের বাক্‌চাতুর্য শোনার পরে কাজের বিশৃঙ্খলা ক্ষমা করা চলে না।

এতক্ষণ বাড়িতে থাকিলে মুখের মাসাজটা সারিয়া লওয়া চলিত। রাত্রি বেলায় বাড়ি ফিরিয়া মেক-আপ্ উঠানো মাসাজ-করা প্রভৃতির কার্যে বহু সময় লাগিবে। নিদ্রায় বিলম্ব হইয়া গেলে আগামী কল্য চেহারার জৌলুষ থাকিবে না। রঞ্জন সেন অপরাহ্নে চা পান করতে আসিবেন।

রঞ্জন সেনের পত্নীরূপে এই একই জীবন, একই রূপচর্চা অপেক্ষা করিয়া আছে। তবু, তবু মনে হয় তাহার জীবনেও অনেক কিছুই হইতে পারিত। মনে হয় সমাজ জীবনের লঘু পরিবেশের ঊর্ধ্বে তাহার পরিপূর্ণতা। সহসা-জাগিয়া-ওঠা রজনীতে কি যেন হারানোর ব্যথা তাহার চিত্তকে বিবশ করিয়া তোলে। কোন্ পথ তাহাকে ডাকিতেছে? সে পথের সন্ধান তাহার জানা নাই। তাহার মধ্যে যেন কোন অজানিত শক্তি তাহাকে মাঝে মাঝে উন্মনা করিয়া তোলে! সে শক্তি তাহার অপেক্ষা অনেক শক্তিমান, নির্মম তাহার আকর্ষণ। যেন নিরালা মুহূর্তে, নিঃসঙ্গ রজনীতে তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কোনও নিদ্রিত, অশান্ত দেবতা জাগিয়া ওঠে, তাহাকে ভাষাহীন স্বরে বলে, 'ললিতা, সকলের মতো সিভিলিয়ান বা জমিদারপত্নী হওয়াটাই তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বিলাসের প্রাসাদের সুপ্তা রাজপুত্রী, চোখ খোল, দেখ তোমার মধ্যে আমি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছি, তোমার মধ্যে আমি আছি। আমাকে আমার চিরপ্রাপ্য সম্মান দাও, আমার নির্দেশ মানিয়া চল। তুমি সাধারণ নও। ললিতা, তুমি কি জান না তুমি শিল্পী?'

কিন্তু এ অনুভূতি কতক্ষণ? পার্শ্বের ত্রিপদীতে বেড-টি স্থাপনার কল-ঝঙ্কারে ললিতা বাস্তব জগতে জাগিয়া ওঠে। তাহার

শাসনকর্ত্রী জননীর কণ্ঠ শোনা যায়—"ললিতা, স্নানের ঘরে গরম জল দেওয়া হয়েছে।"

কিন্তু তবু কি সে শিল্পী? মাঝে মাঝে এইরূপ কোন অস্থির মুহূর্তে অধীর চিত্তে খাতার বুকে ললিতা কিছু কিছু ছন্দে বা গদ্যে রচনা করে। কিন্তু কাহাকেও সে তাহার লেখা দেখায় নাই। কে জানে তাহার কতখানি মূল্য? সেই কি তাহার শিল্প? সেই পথে কি তাহার পূর্ণতা আসিবে?

এবারে গায়কের দিকে চাহিয়া ললিতা অবাক হইয়া গেল। পলকহীন নেত্র তাহার অপরিচিত তরুণের সুর-বিহ্বল মুখে সংলগ্ন হইয়া রহিল। কি উদার, সৌম্য মুখশ্রী! দেহে অপরিমিত যৌবনের সহজ লীলা, আকর্ণ নয়নে সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি, আর কণ্ঠে সুরের নির্ঝর।

"ছেলেটি কে মুরলা?" মুগ্ধা ললিতা প্রশ্ন করিল।

কেমন যেন একটা দৃষ্টিতে সঙ্গীতমগ্ন যুবকের সর্বশরীর লেহন করিতে করিতে মুরলা উত্তর দিল—"এঁকে চেন না? অসিত রায়, ইনিই তো সভার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। শুধু গানেই ওস্তাদ নয়, পড়াশোনায় ভয়ানক ভালো! গত বছর ইংরেজীতে ফার্স্ট হয়ে এবার আবার ইতিহাসে আমাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন।" অসিত রায়ের দিকে আবার অদ্ভুত ভাবে চাহিয়া চাপা, ভাঙা ভাঙা গলায় মুরলা বলিতে লাগিল,—"বড় পরোপকারী। আমি টাকা দিয়ে লোক রাখতে পারি না বলে আমাকে সপ্তাহে দু'দিন বাড়ি গিয়ে পড়ায় সাহায্য করেন। মা'কে মা বলে ডাকেন কিনা। বড় ভালো ছেলে!" ক্রূর শিকারীর দৃষ্টি মুরলার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল।

অসিতের গান শেষ হইল। মেয়েদের নিকট দিয়া পাশ কাটাইয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সহসা তাহার সাদা আদ্দির পাঞ্জাবীর আস্তিন টানিয়া ধরিয়া উত্তেজিত মত্ত কণ্ঠে মুরলা ডাকিল—"পালাচ্ছেন যে? এতদিন না যাওয়ার শাস্তি নিতে হবে না?"

অসিতের প্রশান্ত নেত্রে ক্ষণিক বিরক্তি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। সে তাহার অভ্যস্ত মধুর হাসির সহিত উত্তর দিল, "মাপ করবেন মুরলা দেবী, বড় বেশি কাজ পড়ে গেল।"

চকিতে কণ্ঠস্বর করুণ ও দৃষ্টি সজল করিয়া মুরলা কাতর ভাবে বলিল, "সত্যি এত কাজ আপনার, তাও ভুলে যাই। গতকাল টিউটোরিয়াল ক্লাসটায় আপনার সাহায্য ছাড়া কিছুতেই লেখা আনতে পারি নি বলে ডক্টর রায় কত বক্‌লেন। জানেন তো আমার মাথা! এদিকে কোন টিউটর রাখারও ক্ষমতা নেই।" মুরলা নিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি নত করিল। অসিতের করুণা-বিগলিত মুখের প্রতি চাহিয়া মুরলা টানিয়া টানিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "অবশ্য মা বড় ব্যস্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রপুলী ভালবাসেন বলে নিজে, পরশু জ্বর-গায়ে রাজ্যের খাবার করে পথ চেয়ে ছিলেন। শেষে এলেন না দেখে সব ফেলে দিলেন। বিশ্বাস করুন অসিত বাবু, আমাকে সুদ্ধ একখানাও দিলেন না।" মুরলা গাঢ় রক্তিম অধর ফুলাইল।

অসিত বিব্রত ভাবে বলিল, "আচ্ছা মাকে বলবেন কাল যাবার চেষ্টা কর্‌ব।"

"যাবার চেষ্টা নয়, যেতেই হবে। নইলে অসুস্থ শরীরে মাকে সামলানো আমার কাজ নয়।" হাল্কা পরিহাসের সুরে মুরলা

বলিল। কিন্তু, ললিতা কি ভুল দেখিল? মুরলার নয়নে ক্ষুধার্ত অজগরের তীব্র আকর্ষণী লক্ষ্য।

অসিত ফিরিয়া ললিতার দিকে চাহিল চিরপূজারীর দৃষ্টিতে।—"আপনি গান করেন না মিস্ দত্ত?"

ললিতা প্রথম পরিচয়ের লজ্জা কাটাইয়া বিমূঢ় প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আপনি আমাকে চেনেন?"

"প্রথম দিন থেকেই আমি আপনাকে চিনি।"

সেদিন গভীব রাত্রে যখন চোখে ঘুম আসছিল না, তখন ললিতাব মানস-লোকেব বিপ্লব তাহাব কাছেই ভীতিপ্রদ লাগিল। সামান্য দু'টি কথা, একবাব দেখা! অথচ মনে হয় কত পবিচিত বন্ধু, কত অতীত স্মৃতিব ছায়াপটে আরাধ্য দেবতা! দেহ উন্মাদ হইয়া ওঠে দেহেব স্পর্শেব জন্য, মন ধ্যানস্বপ্নে নিমগ্ন হইতে চাহে। কোথায় গেল ললিতার পরিচিত জগৎ, কোথায় গেল তাহাব ভাবী সিভিলিয়ান পতি? কি এক বন্ধন তাহাকে অসিত বায়েব সহিত বাঁধিয়াছে। কি নিগূঢ় আকর্ষণ তাহাকে ভুলাইল। এই বুঝি তাহার এতদিনেব প্রার্থিত পূর্ণতা।

প্রথম পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হইল। বন্ধুত্বের বৃন্তভাগে বিকশিত হইল প্রেমের অতুল্য কমল। আর সে কমলকণ্টকরূপে জাগিয়া রহিল মুরলা দেবী।

যখন তখন মুরলা ললিতাকে সচেতন করে—"বড় গর্ব অসিতের। সব মেয়েকে নিয়ে নাচিয়ে মজা দেখে। আমার কাছে কিন্তু সমস্ত স্বীকার করে। জানো ভাই"—অন্তরঙ্গ আলাপের সুরে মুরলা বলে—"মাকে বললো মুরলার সব ভার আমার হাতে। ওকে

যতদূর পড়াতে হয় পড়াব আমি পড়ার খরচ দিয়ে”—মুরলা লজ্জিত হাসির অভিনয় করিল।

মুরলার বন্ধু অসিত! মুরলা, যাহার সমস্ত দেহে কামনার হীন প্রকাশ; যাহার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা ঘৃণায় মুখ আকুঞ্চিত করে; যাহার পিতার নাম কেহ জানে না!

কিন্তু, সহস্র সন্দেহ, অসিত-মুরলার নামে শত অপবাদের কুজ্ঝটিকা, দূরে ঠেলিয়া ফুটিয়া ওঠে অসিতের প্রদীপ্ত মুখ, তাহার সহাস্য নয়ন। মুখে এখনও কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু অন্তর বুঝিতে বাকী নাই। অসিতের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, পুস্তকপ্রীতি অপরিসীম, পাঠ্যজগতের মধ্য দিয়াই তাহার অন্তর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ্যবস্তুর আলাপচ্ছলে হৃদয়ের আলাপন শোনা ও শোনানো হইয়া গিয়াছে। ললিতার অবচেতন সাহিত্যিক মনকে অসিত জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার অর্ধজাগ্রত শিল্পীমনকে বিকশিত করিয়াছে। তাই এমন নিঃসঙ্গ রাত্রে ললিতার অন্তর্নিহিত দেবতা বলিয়া উঠে 'ললিতা, আমার রাজ্যে তোমার প্রথম পাঠ দিয়াছি। তোমার চতুষ্পার্শ্বের মূঢ় ব্যবহারিক জগতের বাহিরে প্রেম তোমাকে আনিয়াছে। ললিতা, ইহার নাম ভালবাসা। ভালবাসা শিল্পীর প্রথম সোপান।'

কিন্তু মিলন-স্বপ্নে তন্ময় রজনীতেও মাঝে মাঝে সুকঠোর নির্মম দেবতা আর কি বলিতে চায়? সে বলে, আর কত দেরি? ললিতা, আমি যে প্রতীক্ষা করিয়া আছি। তোমার প্রথম পাঠের পরে দ্বিতীয় পাঠ আছে। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার কামনা অনেক। ললিতা, প্রেমের বাহিরে চলিয়া এস। শিল্পী প্রেমের ঊর্ধ্বে।

সদ্যজাগ্রত নয়নের সম্মুখে অসিতের সহাস্য মুখচ্ছবি সে

অনুভূতিকে নিমেষে বিদূরিত করে। সুতরাং প্রথম প্রেমের মধুরতায় ললিতার দিনগুলি নির্ব্বিবাদে কাটিতে লাগিল। রঞ্জন সেন সে-বারের মতো কার্যস্থলে ফিরিয়া গেলেন। এম. এ. পাস না করিয়া ললিতা বিবাহ করিবে না।

প্রায় এক সপ্তাহ অসিতের কোনও খবর নাই। একবার মুরলার বাড়ি যাইয়া সংবাদাদি লইতে হইবে। দুইচারি বার মুরলার বাড়ি ললিতা গিয়াছে, কিন্তু ললিতার মা তাহা বিশেষ পছন্দ করেন নাই। টালা ট্যাঙ্ক দেখিবার ও সান্ধ্যভ্রমণের অছিলায় ললিতা আজ বাহির হইয়া গেল।

পূর্ণিমার প্রবল জ্যোৎস্নাতে টালা ট্যাঙ্ক দেখিয়া ফিরিবার পথে গাড়ি মুরলার গৃহাভিমুখে ছুটিল।

জ্যোৎস্নাবিহ্বল নীলাম্বরের চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া মনের খুশীতে ললিতা গুনগুন করিয়া গান ধরিল—

"মধু রাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে !
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে !
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে !"

মুরলার শয়ন গৃহের আশমানি রংএর মোটা কাপড়ের পর্দা সরাইয়া হাসি মুখে ললিতা ভিতরে চাহিল।

বিপর্যস্ত, আকুঞ্চিত শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অসিত, উচ্ছৃঙ্খল তাহার বেশভূষা, চক্ষু আরক্ত। আর তাহার বক্ষের

উপর নিজেকে নিপীড়িত করিতেছে মুরলা। শিথিল নীলাম্বরীর অঞ্চল-তলে মুরলার পূর্ণযৌবন দেহ নগ্ন। আলগা চুল মাথার উপরে ঘূর্ণায়মান বিজলীপাখায় ইতস্তত উড়িয়া বীভৎস দেখাইতেছে। অনাবৃত বাহু বিষাক্ত সাপের মতো অসিতের কণ্ঠ গ্রাস করিয়াছে। করাঙ্গুলি অসিতের কুঞ্চিত, ঘন কেশের মধ্যে ব্যাঘ্রনখরের হিংস্রতায় প্রোথিত।

"ললিতা শোন, আমাকে ভুল বুঝে যেও না। মুহূর্তের দুর্বলতা আমার এসেছিল স্বীকার করি! তার জন্য তোমার কাছেও কি ক্ষমা নেই?"

"যা দেখলাম তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত না করে সভ্যসমাজে মুখ দেখিও না। মুরলাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।"

"আমাকে এত বড় অভিশাপ দিয়ে চলে যাবার আগে আমার কথাটাও কি শুনবে না? এই আমার প্রথম অপরাধ। পুরুষের নিরুপায় আত্মসমপর্ণের কথা হয়তো তুমি বুঝবে না। তবে এর কি ক্ষমা নেই?"

"না। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।"

তাহার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। মুরলার সহিত অসিত রায়ের আকস্মিক বিবাহ লইয়া পরিচিত মহলে কিছুদিন আন্দোলন চলিল। কারণ সকলে সন্দেহ করিয়াছিল অসিতের বিবাহ ব্যাপারটি ললিতা দত্তেরই সহিত সম্পন্ন হইবে, মুরলা দেবীর সহিত নহে। বিবাহের পরে নবপরিণীতাকে কলিকাতায় ফেলিয়া রাখিয়া সিংহল কলেজে অধ্যাপনার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া অসিত পুনর্বার

সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। বিশেষত সকলে যখন ধরিয়া লইয়াছিল প্রবল প্রেম হেতু অসিত মুরলার দুর্নাম এবং কলঙ্ক উপেক্ষা করিয়া তাহাকে পত্নীর মর্যাদা দিয়াছে।

ললিতা দত্তের লেখিকারূপে অভ্যুদয়ও আশ্চর্য। কুণো মেয়েটার কলমে এত জোর কে জানিত! ললিতার অন্তরে নির্দয় দেবতা নিস্তব্ধ হইয়াছে। মহাশ্বেতা যদি বিনা আয়াসে পুণ্ডরীককে লাভ করিত তাহা হইলে কবি চিত্তে রেখা-পাত হইত না। ললিতা প্রেমে পূর্ণতা পাইলে হয়তো শিল্পী হইতে পারিত না।

সাফো

"The Isle of Greece—the Isle of Greece,
Where burning Sappho loved and sang!"

এখনও ঈষৎ-বিস্মৃত, অস্পষ্ট এই কবিতার ছত্র দুইটি শুনিলে মনের মধ্যে ধূসর অতীত আবার ফিরিয়া আসে। কত কথা মনে জাগে! কত আধভোলা, কত অদ্ভুত—আশ্চর্য স্মৃতি!

মনে পড়ে আমার জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তিক্ত ও বীভৎস রসের সমবায়ে চিত্তপটে আজও তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে।

মনে পড়ে সাফোকে—হাস্যলাস্যমুখরা কৃষ্ণনয়না গ্রীক সুন্দরী; রৌপ্যশুভ্র জানু তাহার, উন্নত বক্ষ কঠিন গজদন্তের মত, পদাঙ্গুলি তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল, নীল ইন্দ্রমণি তাহার চক্ষে। আর, সমুদ্র-উত্থিতা বাসনা ও প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি তাহার উপাস্যা।

আর মনে পড়ে আর একজনকে—উদ্ধত যৌবনের তাড়নায় যাহার সাফো সাজিবার স্পর্ধা হইয়াছিল।

তাম্রের ন্যায় অনুজ্জ্বল রক্ত তাহার গাত্রবর্ণ, কালো চুল পিছনে টানিয়া বাঁধা। ক্ষীণদেহ একটু অবনত। সঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণ নয়ন তাহার তির্যক ভঙ্গিতে উচ্চ গণ্ডদেশের উপর অবস্থিত। অধর তাহার একটি কাটা দাগে বিভক্ত।

লেস্‌বস্‌ কোথায় আজ গ্রীক সাফোর জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে? দ্রাক্ষাকুঞ্জে তপ্ত রৌদ্র আজ বৃথাই সাফোকে খুঁজিতেছে। বন্য অলিভ ও দাড়িম্বকুঞ্জ গোপন অন্তরাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে কাহার পরিতৃপ্তির জন্য? ভায়োলেট ও হেয়াসিন আজও তোমার

জন্য বিকশিত হয় অযথা, নীলাভ চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ নারীবক্ষে আজও লুণ্ঠিত হইতেছে।

কোথায় তুমি সাফো? প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াইয়াছিলে নারী হইয়া। নারীর সহিত প্রেম বিশ্বে তোমার আশ্চর্য অবদান। কিন্তু অবশেষে পুরুষের কাছে পরাজয় ঘটিল। বিধাতা প্রতিশোধ লইতে জানেন।

ফায়ন তোমাকে ভালবাসে নাই। তোমার জ্বলন্ত প্রেম, তোমার মুখের কাব্য দিয়া ফেরিঘাটের মাঝি সে কি করিবে? তাহার দৃষ্টি পড়িল প্রতিবেশী কন্যা লিডিয়ার প্রতি। দুঃসহ বেদনায়, অতৃপ্ত কামনায় অভিমানিনী তুমি, নীলসমুদ্রে জীবনের সমাপ্তি ঘটাইলে।

কিন্তু, কেন সাফো? জগতে আরও অন্য পুরুষ ছিল—অনেক গ্রীক পুরুষ ছিল, তোমাকে কামনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি করিয়াছিলে একমাত্র ফায়নকে। নারীর সহিত মিলনে তোমার রুচি গেল—সে তৃষ্ণা ফায়নকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়া অজস্র কাব্যসৃষ্টিতে ভাঙিয়া পড়িল ঃ—

"Phaon, quench my raging fire
Ere I die of love's desire."

বাসনা ও প্রেমের যে প্রথম মহিলা কবি, হে অদ্বিতীয়া জগৎ কবি, তোমার অসহ্য হৃদয়াবেগ, উত্তপ্ত রক্তস্রোত আজও তোমার লেখনীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

তাহাকে প্রথম দেখি খড়্গাপুর স্টেশনে। গাড়ি বিরাট প্ল্যাটফর্মের একটি কোণে দাঁড়াইয়াছে। দিদির সহিত মহিলা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঘাটশিলা যাইতেছি স্বাস্থ্য কামনায়। সেখানে

জামাইবাবু আগেই বাড়ি দেখিয়া রাখিয়া আমাদের নামাইয়া লইতে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কলা লইয়া দরদস্তুর করিতেছি, শুনিলাম শুষ্ক ভদ্রতার স্বর দিদির—"এই যে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?"

চাহিয়া দেখি রুক্ষ রৌদ্রালোকে সে দাঁড়াইয়া; তাম্রোজ্জ্বল গ্রীবা, বাহু আবৃত করিয়া সাদা কলার-তোলা পুরা আস্তিনের জামা, পায়ে ফিতা-বাঁধা কালো পুরুষালি ঢংএর জুতা, সাদা সরুপাড় শাড়ী।

পুরুষের মত ভঙ্গি তাহার, হাতে মোটা চামড়ার একটি টাকা রাখিবার থলে! পার্শ্বে ক্ষীণা লতাপল্লবিনী একটি কিশোরী, অসহায়ভাবে চাহিয়া আছে, চক্ষের নিম্নে গাঢ় কালিমা।

"এই বিভাকে নিয়ে এক মাসের জন্য ঘাটশিলাতে যাচ্ছি। ওর বাবা ব্যস্ত আছেন, নিজে যেতে পারলেন না, তাই। বিভার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। এক মাস থাকলে ও নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে।" পুরুষের ভঙ্গিতে বাম হস্তে ললাট হইতে রুক্ষ কেশ অপসারিত করিয়া মন্দিরা বলিল, "এই বুঝি আপনার বোন ?"

তাহার দৃষ্টির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম। নারী হইয়া পুরুষের তীব্র দৃষ্টি সে কোথায় পাইল ? খর অনুসন্ধানী চক্ষে আমার সঙ্কুচিত দেহ আপাদ-মস্তক দেখিয়া সে বলিল, "তুমি কি স্কুলে পড় ?"

দিদি আমাকে ঠেলিয়া পাশে সরাইয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিলেন—"সুমনা কলেজে পড়ে। পূজোর ছুটিতে ঘাটশিলা চলেছে আমার সঙ্গে। উনি ওখানে জায়গা কিনেছেন।"

মন্দিরা ও বিভা তাহাদের কামরার দিকে চলিয়া গেলে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের অপস্রিয়মান মূর্তির প্রতি চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া রুদ্ধ আক্রোশের স্বরে দিদি বলিলেন, "দেখলেই গা জ্বলে উঠে!"

"কাকে দেখলেই গা জ্বলে উঠে দিদি?"

হাল্কা, সাদা জুতামোজা-পরা নিজের পা দুখানি লক্ষ্য করিয়া দিদি বলিলেন, "মন্দিরা সেনের সঙ্গে আলাপ আমার ওঁর চাকরির জায়গা থেকে। ওখানে আমাদের বাড়ীর পাশে গ্যের্লস স্কুলে ও পড়ায়, থাকেও হোস্টেলে। বিভা মেয়েটি ওর মতোই টীচার। দুজনে অতি বন্ধুত্ব। যত-সব কেলেঙ্কারি।"

বিমূঢ় প্রশ্ন করিলাম, "এতে আর কেলেঙ্কারির কি আছে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে দিদি বলিলেন, "অস্বাভাবিক অনাচারকেই আমরা কেলেঙ্কারি বলে থাকি। ভগবানের নিয়মের বিপক্ষে যাওয়া শুধু পাপ নয়, পৈশাচিকতা।"

দিদির গম্ভীর বচনবিন্যাস আমার মনে কি এক অজানা অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল। কলার কাঁদি বেতের ঝুড়িতে রাখিয়া বলিলাম, "কী তুমি বলতে চাইছ দিদি? আভাস দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলায় ক্ষতি নেই।"

চকিতভাবে আমার পানে চাহিয়া দিদি বলিলেন, "সাফোর কবিতা পড়িস নি?"

তখনও সাফোর কাব্যের সহিত পরিচয় হয় নাই, বলিলাম, "সাফোর কবিতা পড়ি নি, কিন্তু তাঁর বিষয়ে সব জানি। মন্দিরা সেন কবিতা লেখেন বুঝি?"

"কবিতা লেখে না। আধুনিক সাফোর ওইটুকু শুধু বাদ আছে।"

"তার মানে ?"

দিদি অপ্রতিভ হাস্যে লজ্জা চাপা দিয়া বলিলেন, "তার মানে ন্যাকোর প্রেম।"

মুহূর্তে সব বুঝিলাম। তীব্র দৃষ্টি, পৌরুষ ভঙ্গি সকলই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কি বীভৎস, কি ঘৃণিত !

আমার স্তম্ভিত মুখের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া দিদি কহিলেন, "উনি বলেন স্কুল-কলেজে এ রকম কত আছে। মা-বাবা মেয়েদের স্কুলে হস্টেলে কেবল মেয়েদের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত হন, ভাবেন আর ভয় কি। কিন্তু যার মনের গতি যেদিকে সে সেদিকে যাবেই—অযথা শুদ্ধ মেয়েদের সাহচর্যে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট। মেয়েতে মেয়েতে যা ন্যাকামি, সেটা এরই রূপান্তর মাত্র।"

গাড়ি খড়্গপুর ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধা প্রকৃতির দিকে চাহিলাম। শ্যাম বনশোভার অন্তস্তলে কোথায় বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার আভায় সমস্ত বনভূমি উদ্দীপ্ত। রুক্ষ লাল মাটির দিকে চাহিয়া উন্মনা, অন্যমনস্ক স্বরে বলিলাম, "তাই তো।"

ঘাটশিলায় পাহাড় আছে, সুবর্ণরেখার জলরেখা আছে, অরণ্যানীর নিবিড়তা আছে—আর আছে অনল। —জামাইবাবুর ছোট ভাই এম. এ. পরীক্ষার পর দাদার ভূসম্পত্তি দেখিতে আসিয়াছে। আগে কখনও জানিতাম না পুরুষ এত সুন্দর হয় —আজ প্রথম দেখিলাম। দুই বৎসর দিদির বিবাহ হইয়াছে, অনলকে দেখি নাই। বিবাহ উৎসবে সে যোগদান করে নাই। তাহার তখন অ্যাপেণ্ডি-সাইটিসে অস্ত্রোপচার হইতেছিল।

রমণীর সহস্র কামনা তাহার দেহে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তাহার পরিপূর্ণ রক্ত-অধরোষ্ঠের একটি চুম্বনের জন্য ক্রিস্‌চিনা আবার রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন। ক্ষণকাল বাসনাবিহ্বল চক্ষু তাহার, পল্লবসমাকুল। প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটী, দৃঢ় বাহুতে সে প্রকৃত নারীমনোহর পুরুষ।

গ্রীক সৌন্দর্য দেখি নাই। তবে তাহার দিকে চাহিয়া আপোলোর মদিরতা, কিউপিডের চাপল্য, হারকিউলিসের শক্তি একত্র সমাবেশের কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম।

রূপ তাহার অনন্যসাধারণ, মোহন তাহার সবকিছু। কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বর তাহাকে হৃদয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমার তিলে তিলে জাত প্রেম দুই বৎসর পরে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে সে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে অন্য কাহিনী।

গোপালপুর কলোনিতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম সকালের উষ্ণ সূর্যালোকে। দেখিলাম দূরে মন্দিরা বিভার হাত ধরিয়া ক্ষিপ্র শিকারীর ভঙ্গিতে তাহাকে লইয়া ফুলটুঙ্গি টীলার উপরে উঠিতেছে। সহসা মনে পড়িল কলিকাতার স্নানের ঘরের দেওয়ালে একটি দৃশ্য। বিরাট মাকড়সা হাঁ করিয়া অর্ধগ্রাস করিয়াছে একটি আরশোলাকে। চামড়া-ওঠা মৃত্যু যন্ত্রণায় তাহার সে কি ব্যাকুলতা!

জামাইবাবু চীৎকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া দিদিকে জানাইলেন —"সুজাতা, ওই যে তোমার সাফো।"

"সাফো? ব্যাপার কি বৌদি?" কৌতূহলী দৃষ্টিতে অনল চাহিল। দিদি আস্তে আস্তে তাহাকে কতকগুলি কথা বলিলেন। জামাইবাবু বিদ্রূপমিশ্রিত চাপা হাসিতে উল্লাস ব্যক্ত করিলেন। অনলের কৃষ্ণচক্ষু-তারকা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—"ওঃ, লেস্‌বিয়ান্ লাভ।"

সেইদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। ঘাটশিলার নির্জন পথে পথে ম্লান চাঁদের আলোয় ছায়ার মত গ্রীক নারী ঘুরিতেছে। সাফোর মুক্তাশুভ্র পরিচ্ছদ পশ্চাতে ধূলি চুম্বন করিতেছে, বাম হস্তে লায়ার যন্ত্র। সূক্ষ্মাগ্র, গোলাপীনখর-খচিত তর্জনী তারে আঘাত দিয়া ক্ষীণ ধ্বনি তুলিয়াছে। অন্য হস্তে কুঞ্চবল্লরী সরাইয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে সে কাহাকে খুঁজিয়া মরিতেছে?

জ্যোৎস্নাবিগলিত লেস্‌বসের রাত্রি। আঙুরের মধুর মতো পাটল, চিক্কণ ত্বকে চন্দ্রালোক ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। পুষ্পবিতানে মর্মর বেদীবক্ষে দুইটি সংযুক্তমূর্তি—লঘু মেঘখণ্ড সরিয়া গেল, আলো উজ্জ্বল হইল। আশ্চর্য! উভয়েই নারী!

সুবর্ণরেখার তীরে তীরে আতাম্রবর্ণা মন্দিরা, চক্ষে তাহার হীন কামনার প্রকাশ, দেহে তাহার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেও যেন কাহাকে চায়! লোলুপ হস্তে মন্দিরা গৈরিক নদীজল স্পর্শ করিতে গেল! তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল হস্ত-প্রসারণ এড়াইয়া জল সরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ধারা শুষ্ক হইয়া তাহার বক্ষে উপলরঞ্জিত দগ্ধ রক্তমাটি জাগিয়া উঠিল। নিদ্রাজাগরণে শুনিলাম Radclyff Hall-এর আর্তধ্বনি—"Acknowledge us, Oh God before the whole world. Give us also the right to our existence.

খাবার টেবিলে অনল বলিল, "বউদি ভাই, সাফোকে তো দেখালে কাল। আলাপটা কবে হবে?"

দিদি ঘৃণায় আকুঞ্চিত মুখে বলিলেন, "রামো, রামো! ওইসব কাটখোট্টা পুরুষালি ঢংএর মেয়েদের দুচক্ষে দেখতে পারি না আমি। আধুনিক বলেই কি তোমাদের কিছুতেই অশ্রদ্ধা নেই?"

অনল পশ্চাতে গ্রীবা হেলাইয়া হাসিয়া উঠিল—"অশ্রদ্ধার কথা এতে কি আছে বৌদি? কৌতূহল জেগেছে বলেই না আলাপ করতে চাইছি। অস্বাভাবিক কিছু হলেই তাকে জানা-চেনার ইচ্ছা হয়।"

জামাইবাবু টেবিল চাপড়াইলেন—আমার বদলীর চাকরিতে দেশ বিদেশ ঘুরেও সুজাতার সঙ্কীর্ণতা গেল না। আরে, দেখতে বা মিশ্‌তে দোষ কি? বিয়ে না করলেই হ'লো।"

"ধন্য তোমাদের আধুনিক শিক্ষা? বিয়ের কথা ওঠে না। যাকে বিদ্রূপ করি তার সঙ্গে মেশবার প্রয়োজন কি?"—দিদি বিরক্ত হইলেন।

"আহাঃ বউদি, আমি হচ্ছি সাইকোলজির ছাত্র। একটু কেবল স্টাডি কর্‌তে চাই। ওইতো রূপ, বয়সেও তো বোধহয় আমার বড়, আর তোমার ভাষাতে, ওইতো প্রবৃত্তি। কোনও আশঙ্কা নেই, ভাই। একটু মজা দেখতে দাও না।" আমার দিকে ফিরিয়া কোমল অনুরোধের সুরে অনল বলিল, "কাল তুমি গিয়ে ওকে এখানে বৌদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে বলবে! বৌদির মতো তোমার তো কোনও প্রেজুডিস্ নেই। করবে তো সুমনা?"

তাহার কোন অনুরোধে না বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তখনই রাজী হইলাম।

স্টেশনে দিদির কাছে মন্দিরা বাসস্থানের নির্দেশ দিয়াছিল। ছোট শহর, একতলা বাংলোখানা খুঁজিতে বিলম্ব হইল না। দরোয়ানকে বাহিরে রাখিয়া আমি ভিতরে গেলাম।

নির্জন দ্বিপ্রহর। একখানা ছোট ঘরে ইতস্তত চাল ডাল

ছড়ানো। একপাশে একটি ষ্টোভ। পাশের ঘরে রুদ্ধ দরজা জানালার সংখ্যা দেখিয়া মনে হইল সেখানি বড়। সামনের বারান্দায় দ্বার খোলা থাকিলে গৃহটির একাংশ দেখা যায়।

চারিপাশে নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে ভয় হইল। উঁকি দিয়া জানলা হইতে দেখিতে যাইয়া সহসা মন্দিরার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে স্থির হইয়া গেলাম।

শয্যার এক অংশে বিভা নিদ্রিত, তাহার চক্ষু নিমীলিত, মুখ পাণ্ডু-মূর্চ্ছিত। তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্দিরা কি যেন দেখিতেছে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের হিংস্র উগ্রতায় দুই চক্ষু তাহার জ্বলিতেছে, মুখ বিকৃত। মনে হইল কোমল করুণ নারীর মুখের সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই।

অনলকে সমস্ত বলিলাম। পিছনের ঘেরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে সে মোটা ডাক্তারি বই পড়িতেছিল। বইখানা মুড়িয়া আমার দিকে চাহিল—"বোকামেয়ে, চলে এলে পালিয়ে? কাল আবার যেতে হবে।"

"আর আমাকে বলবেন না, অনলদা।"—নিজপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিলাম, "বললেও হয়তো আস্‌বে না ও। ও-সব মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেশে না।"

"কি জানি! দেখতে দোষ কি চেষ্টা করে? হাতে আমার এখন বিশেষ কোনও কাজ নেই।" —অনলের মুখে ক্রূর ছায়া পড়িল। কিসের নিস্ফলতায় সে হীরকদন্তে অধর চাপিয়া ধরিল। চক্ষু তাহার সঙ্কুচিত, অধর প্রসারিত।

"বয়েস তোমার কম সুমনা, কিছুই বোঝ না। যে মেয়ে পুরুষের দাবীতে ভাগ বসায় তাকে শাস্তি যে দিতেই হয়। পুরুষকে

বাদ দিয়ে যার চল্‌তে পারে সে তো পুরুষের শত্রু। তাই তাকে জয় করে প্রতিশোধ নিতে হয়। ভগবান চিরদিন নারীকে এখানে পুরুষের কাছে হার মানিয়েছেন। সাফোরও হার হয়েছিল।”

মন্দিরা চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিভার সহিত আসিয়াছিল। তাহার পুরুষালি ঢংএর বেশবিন্যাসের দিকে চাহিয়া অনল একটু হাসিল। জানি না পুরুষবেশে চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া অর্জুনের অধরোষ্ঠে এমনি সকৌতুক হাসি দেখা দিয়াছিল কি না।

বামহস্তে স্যাণ্ডউইচ্ টুকরায় কামড় দিয়া এবং ডানহস্তে মন্দিরা চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়া অনলের প্রতি লক্ষ্য করিল। রূপপিপাসুর পরিতৃপ্তি ভিন্ন তখনও তাহার চক্ষে কিছু ছিল না। নির্জীব পুত্তলীর মতো বিভা এলোমেলো ভাবে খাইয়া যাইতেছিল, দৃষ্টিতে তাহার ছিল একমাত্র মন্দিরা।

দেখিলাম অনলের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। সৌন্দর্যের নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব বিকাশ আছে। অনলের লুব্ধ অধরের ঈষৎ আকুঞ্চনে, আকর্ণবিস্তৃত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিক্ষেপের মূল্য হয়তো জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বা বক্তার আজন্ম সাধনার অপেক্ষা নারীচিত্তজয়ে অধিক কার্যকরী।

ঢাকা বারান্দায় চায়ের টেবিল। টিপাইতে রক্ষিত উজ্জ্বল ‘ডে লাইট’ লণ্ঠনের আশে পাশে অসংখ্য পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়া মরিতেছে, কেহ বা অহেতুক ভ্রমণক্লান্ত হইয়া তপ্ত আলোর উপরেই বসিতেছে। বিচিত্রিতপক্ষ পতঙ্গকুল লাফাইয়া সম্মুখের ঘাসের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে।

সেইদিকে চাহিয়া কোমল-মধুর কণ্ঠে অনল বলিল, “মিস সেন, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। সন্ধ্যা হয়ে গেল।”

দিদি মিষ্টান্নের পাত্র সরাইতে সরাইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বিভা চকিত ঈর্ষার দৃষ্টিতে অনলের প্রতি চাহিল। কিন্তু, মন্দিরা সেন রাজী হইল।

গেট খুলিতে যাইয়া মন্দিরা আমার দিকে ফিরিল, "বাড়ী থেকে ফটক তোমাদের অনেকটা দূর। তুমি ফিরে যাও সুমনা। আজকালের মধ্যে আমি আবার আসব। বেশ একসঙ্গে বেড়ানো যাবে।"

"আহাঃ, দেখি গেটটা আমাকেই খুলতে দিন, মিস সেন। ছেলেরা থাক্‌তে এসব কাজে মেয়েরা কেন? দ্বি-অর্থক-ভাবে 'ছেলে' ও 'মেয়ে' শব্দের উপর জোর দিয়া যেন প্রভেদ দেখাইয়া অনল বলিল। সাদা গরদের আস্তিন গুটাইয়া অনল মন্দিরাকে সরাইয়া গেট খুলিতে গেল।

দেখিলাম স্বেচ্ছায় অনলের দক্ষিণ হস্ত যেন অজানার ভান করিয়া মন্দিরার দেহ সজোরে নাড়িয়া গেল। স্তিমিত আলোকে চাহিয়া দেখিলাম মন্দিরার বিবর্ণ মুখ আরক্ত, দ্বিধা-বিভক্ত অধরটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

জানি না ফায়ন অনল অপেক্ষা সুপুরুষ ছিল কি না, নারী-হৃদয় জয়ে তাহার অস্ত্র অনল অপেক্ষা মারাত্মক ছিল কি না। শুধু জানি তাহারই জন্য সহস্রবন্দিতা, শ্রেষ্ঠা মহিলা-কবি সাফোর হৃদয় উন্মাদ হইয়াছিল, আর উন্মাদ হইয়াছিল সাফোর যৌবনব্যাকুল গ্রীক দেহ। সেই উন্মাদনার শান্তি হইল মিটিলেনীর নীল সমুদ্রজলে। ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধে সাফো বিদ্রোহিনী হইয়াছিল—কিন্তু অবশেষে সেই নিয়ম-জালে সে বন্দিনী হইল। প্রতিভা-প্রদীপ্ত জীবন বিসর্জন দিয়া সাফো পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

মন্দিরা আসিতে লাগিল প্রায় প্রত্যহ। কোন কোন দিন দুর্বলতার অজুহাতে বিভাকে বাড়ি রাখিয়া অনলের সহিত সে একাকিনী ভ্রমণে বাহির হইত। ঘাটশিলার জলবাতাসের গুণে ইদানীং বিভার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু কেমন যেন একটা অশান্তি, অস্থিরভাব তাহাকে আশ্রয় করিল। মাঝে মাঝে যেন সে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিত। এক এক সময় নিদারুণ একটা আক্রোশ ও তিক্ত দৃষ্টিতে তাহাকে অনলের দিকে চাহিতে দেখিতাম—দেখিতাম বিফল কোপে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। অর্ধভুক্ত আরশোলা বোধ হয় আর মাকড়সাকে এড়াইতে চাহে না। যাহার উপায়ান্তর থাকিবার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার অন্য গতি নাই।

দেখিতাম মন্দিরার ক্রমবিবর্তন। কলার-তোলা দীর্ঘ-আস্তিন জামা সে ত্যাগ করিল, ছোট হাতার রংচঙা ব্লাউস রাত্রি জাগিয়া অনভ্যস্ত হস্তে সেলাই করিল। হাট হইতে রং-করা সস্তা শাড়ী কিনিয়া বিশীর্ণ দেহকে নবরূপ দিবার প্রয়াসে রত হইল। বিহারীদের রূপার ঝুমকা কানে ঝুলাইয়া, হাতে গালার জড়ি-জড়ানো চুড়ি পরিয়া রাতারাতি সে নারীত্বের পদলাভে উৎসুক হইল। স্বল্প কেশে উচ্চ গণ্ডকে ঢাকিবার ও কাটা ঠোঁটের বিকৃতি গোপন করিবার সে কি তাহার অদম্য প্রয়াস।

দেখিতাম অনলের পরিবর্তন। মন্দিরার প্রতি একান্ত মনোযোগ তাহার ধীরে ধীরে করুণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যে রূপান্তরিত হইতেছিল। ঘৃণামিশ্রিত অবহেলা তাহার আচার ব্যবহারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিজিত হৃদয়ের উপর অধিকার খাটাইতে উদ্যমের প্রয়োজন হয় না।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নদীর ধারে আমরা সকলেই বেড়াইতে গিয়াছিলাম। মন্দিরা বারে বারে অনলের গাত্রের সহিত ইচ্ছা করিয়া গাত্র সংলগ্ন করিতে লাগিল। অঙ্গের বসন অকারণেই যেন তাহার চ্যুত হইতে লাগিল। নারীর স্বভাব যে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে তাহার লজ্জারও অবকাশ নাই।

কিন্তু এ সব কাহার জন্য? নির্লিপ্ত পুরুষের দৃষ্টি পথের গুল্ম-লতায়। অপার সৌন্দর্য বহন করিয়া তাহার জগতে সে একাকী। মর্মরমসৃণ ললাটে, রোমান নাসিকায়, সূক্ষ্মাগ্র চিবুকে কোন অনু-ভূতিই ধরা যায় না।

বিভা রাশি রাশি ফুল তুলিতেছিল। লাল কৃষ্ণচূড়া, গোলাপের সহিত সাদা টগর, হলুদ ও বেগুনি বনপুষ্প মিশাইয়া সে তোড়া বাঁধিয়া ফেলিল। বিনীতা, অনুরক্তা দয়িতার ভঙ্গিতে সে মন্দিরার নিকটে অগ্রসর হইয়া চোখে মুখে কেমন একটা সলাজ অভিমানের ভাব ফুটাইয়া বলিল, "তোমার জন্য ফুল এনেছি।"

অন্যমনস্কভাবে তোড়াটা লইয়া মন্দিরা অগ্রগামী অনলের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সেদিকে চাহিয়া বিক্ষিপ্ত চাপাস্বরে বিভা দাঁত কড়মড় করিল—"Devil take him! Oh, devil take him!"

পাহাড়ের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম অনল অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। দুই হাতে ফুলের তোড়াটি ধরিয়া মন্দিরা একা দাঁড়াইয়া, বন্যপুষ্পের পরাগদলে তাহার আত্মবিস্মৃত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তির্যক চক্ষে লাঞ্ছিতা অপমানিতার দৃষ্টি। মনের উত্তেজনায় বিভক্ত অধর ঘন আকুঞ্চিত হইতেছে। তাহাকে যেন আরও বীভৎস লাগিল।

আমাদের ঘাটশিলা ছাড়িবার দিন সমাগত হইয়া আসিল। দিদি আর কিছুতেই থাকিতে রাজী হইলেন না। অনলও দিদিকে সমর্থন করিল।

যাত্রা করিবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অনলের গৃহসংলগ্ন গুদাম ঘর হইতে আমার ভ্রমণসঙ্গী ছোট অ্যাটাশেকেস্‌টি লইতে আসিয়া মন্দিরা সেনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। দরজার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া আমি অনলের ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম।

আরাম কেদারায় অলস সৌন্দর্যে অনাসক্তভাবে বই হাতে অনল বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্দিরা।

"বাজে কথা বলে নষ্ট করবার সময় আমার নেই"—অনলের রূঢ় স্বরের উত্তরে মন্দিরা কাতরভাবে বলিল, "যাবার আগে আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও। আমাকে কেন তুমি ঘৃণা কর ?"

"কেন করি তুমি সেটা ভাল করেই জান।"

"আমার কথাটাও ভেবে দেখ। ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে মানুষ, মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। আমার শরীর অন্যরকম। যখন ভালবাসার প্রয়োজন হ'ল তখন পুরুষের দেখা পেলাম না।"

"ছেলেবেলার ভুল ক্ষমা করা চলে। কিন্তু বেশি বয়সেও তোমার সংশোধন হ'ল না ?"

"অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে। আর তাছাড়া কোনও পুরুষ কোনদিন আমার দিকে তাকিয়ে দেখল না যে।" অত্যন্ত প্রয়াসের সহিত মন্দিরা কথাটি বলিল।

অস্পষ্ট স্বরে একটা বিদেশী শপথের শব্দ উচ্চারণ করিয়া কঠিন নীরস কণ্ঠে অনল বলিল, "যাই হোক, কথা কাটাকাটি করবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। তোমার মত মেয়েকে

আমি ঘৃণা ছাড়া কিছুই কর্‌তে পারি না।” অনল পুস্তকের পাতায় মনঃসংযোগ করিল।

“আমার বেলাতেই তোমরা দোষ দেখ? অথচ গ্রীক কবি সাফোও তো এই রকম ছিলেন। তাঁকে তো তোমরা ঘৃণা কর না, তাঁকে তোমরা দেবী বলে পূজো কর।”

এইবার অনল পুস্তক হইতে মুখ তুলিল, তীব্র বিদ্রূপের অর্থাত্মক দৃষ্টিতে মন্দিরার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিতৃষ্ণার সহিত চাপা গলায় বলিল, “তুমি সাফোই বটে!”

পলকে মন্দিরার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অনলের সহিত সাক্ষাতের প্রথম দিনের ন্যায় তাহার বিকৃত অধর ঘনঘন কম্পিত হইতে লাগিল।

পরের দিন প্রভাতে বিভার ব্যাকুল আহ্বানে আমরা সকলে তাহাদের বাসাবাড়িতে উপস্থিত হইলাম। শয়নগৃহের পাশের ঘরটি মন্দিরা ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তরকারী কাটিবার বড় ছুরিটা সে ব্যবহার করিয়াছিল।

লেস্‌বসের স্বপ্নময় পটভূমিকায় প্রদীপ্তা মহিলা কবি—আর রূপহীনা, নিঃস্বা মন্দিরা·········

সহস্র বৎসর পূর্বে সাফো মরিয়াছিল। আজ মন্দিরা মরিল। গ্রীক্ নারীর মদিরলাবণ্য, বহুবন্দিতার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা, কিছুই তাহার ছিল না। সে ছিল অনাথা, দরিদ্রা স্কুলশিক্ষয়িত্রী!

তবু উভয়ের একই পরিণতি!